Tinni O Bonya by Md. Jafar Iqbal

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com

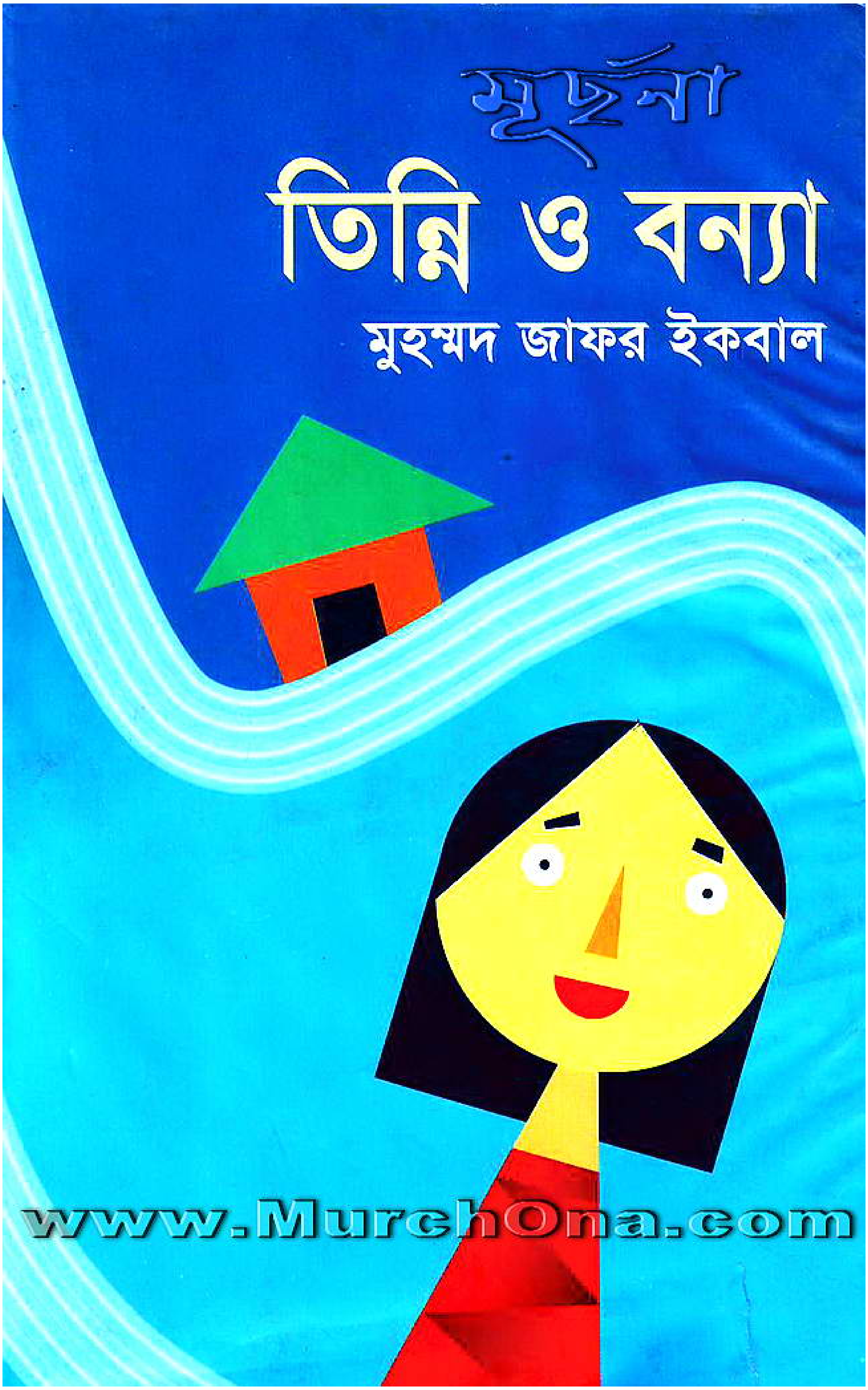
মূর্ছনা
তিন্নি ও বন্যা
মুহম্মদ জাফর ইকবাল
www.MurchOna.com

সূচি

ঝুম্পু	৭
গ্রাউল	১৮
শকসো	২৬
ফ্রাণী	৪২
হেঁচকি	৫৪
নূপুর	৬২
তিন্নি ও বন্যা	৭৬

মূর্ছনা
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
suman_ahm@yahoo.com

ঝুম্পু

ফাইনাল পরীক্ষার শেষে সিলেট থেকে ঝুমুর আমাকে চিঠি লিখল, চিঠির বিষয়বস্তু এরকম : অনেকদিন আমাকে দেখে না, আমি কি আগের মতোই বেকুব আছি, নাকি কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে সেটা দেখার তার কৌতূহল। তাই পরীক্ষা শেষ হবার পরই আমি যেন সিলেট চলে আসি।

ঝুমুর আমার ছোট খালার মেয়ে, বয়সে আমার থেকে বছর দুয়েক বড় হতে পারে, কিন্তু কথাবার্তা খুব চ্যাটাং চ্যাটাং! তাকে দেখে মনে হয় কেউ বুঝি একটা শুকনো কাঠির মাঝে আলু গেঁথে দিয়েছে। তার ছোটজনের নাম বাবু যদিও তার চেহারার মাঝে কোনো বাবুয়ানার চিহ্ন নেই—গাবদা-গোবদা বোকা-বোকা চেহারা।

পরীক্ষা শেষ হলে সবাই কতরকম আনন্দ করে—নাটক-সিনেমা দেখে, গিটার বাজানো শেখে, হৈচৈ করে ক্রিকেট খেলে, কেউ-কেউ আবার কক্সবাজার রাঙামাটি বেড়াতে যায়। আমি কখনো কিছু করি নি, তাই ঝুমুরের চিঠি পেয়ে এবারে আমি ঠিক করে ফেললাম যে-করেই হোক সিলেট যেতে হবে। আব্বা-আম্মার পিছনে ঘ্যানঘ্যান করে জ্বালাতন শুরু করলাম। আমার ঘ্যানঘ্যান করায় কাজ হল বলা যেতে পারে, একরকম বিরক্ত হয়েই আব্বার পরিচিত এক বন্ধুর সাথে আমাকে সিলেটে খালার বাসায় পাঠিয়ে দিলেন।

আমি যখন ছোট খালার বাসায় পৌঁছালাম তখন সন্ধে হয়ে গেছে। দরজা খুলে দিল প্রায় পরীর মতো দেখতে খুব সুন্দর চেহারার একটা মেয়ে। আমাকে দেখে চিৎকার করে বলল, "এসে গেছে! এসে গেছে!! রাজু এসে গেছে! পিপীলিকাভুক রাজু!"

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

আমি যখন ছোট ছিলাম তখন নাকি মাঝে মাঝে পিঁপড়া মেরে খেতাম—সেজন্যে কেউ-কেউ আমাকে পিপীলিকাভুক রাজু ডাকে, কিন্তু এই মেয়েটি কেমন করে আমার এই নামটা জানল! আমি অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকালাম এবং হঠাৎ করে আবিষ্কার করলাম সে ঝুমুর! ছোট খালার বড় মেয়ে যাকে এই কয়দিন আগেও দেখাত একটা কাঠির মাঝে গেঁথে-রাখা আলু। আমি অবাক হয়ে বললাম, "ঝুমুর! তুমি?"

ঝুমুর চোখ পাকিয়ে বলল, "ঝুমুর কী রে? আমি তোর বড় না? বল ঝুমুর আপু—"

আমি বললাম, "ঝুমুর আপু? তুমি—তুমি—"

"আমি কী?"

"তুমি দেখতে ভালো হয়ে গেছ!"

ঝুমুর আপু খপ করে আমার চুলের গোছা ধরে বলল, "তার মানে তুই বলতে চাস আমি আগে দেখতে ভালো ছিলাম না?"

আমি নিজেকে কোনোভাবে ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, "ছিলে না তো! আগে দেখতে ছিলে একটা ঝাড়ুর কাঠির আগায় একটা আলু—"

"দেব একটা থাবড়া—" বলে ঝুমুর আপু সত্যি সত্যি থাবড়া দেওয়ার জন্যে এগিয়ে আসছিল, কিন্তু তার আগেই আমাদের চ্যাচামেচি হৈচৈ শুনে ছোট খালা ছোট খালু হাজির হলেন, পিছুপিছু বাবুও এসে হাজির হল। আমি সালাম করলাম, ব্যাগ রেখে মায়ের চিঠিপত্র আর মিষ্টির বাক্স বের করে দিলাম, অনেক দিন পর দেখা হলে সবার যেরকম আহা উহু করার কথা সেসব করা শুরু হল।

গোসল খাওয়া সবকিছু সেরে রাতে আমরা বাচ্চারা গল্প করতে বসেছি। ঝুমুর আপু এবারে ক্লাস নাইনে উঠবে, কিন্তু তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় সে বুঝি ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে গেছে। কথাবার্তায় খুব তেজ, আমাকে জিজ্ঞেস করল, "কয়দিন থাকবি, নাকি আম্মু আম্মু করে কেঁদে ভাসাবি?"

আমি ঘাড় শক্ত করে বললাম, "কী বল তুমি! একশোবার থাকব।"

"গুড। কয়দিন থাক, অনেক মজা করব আমরা। আমি একটা দল খুলেছি, সেটার মেম্বার করে দেব তোকে।"

"কিসের দল?"

"নাম দিয়েছি কুদূদ।"

"কুদূদ? এটা আবার কীরকম নাম?"

"কুসংস্কার দূরীকরণ দল। সংক্ষেপে কুদূদ। সব কুসংস্কার দূর করে ফেলব একে একে। একটা খাতা কিনে সেখানে কুসংস্কারের লিস্ট করা শুরু করেছি। দুইশো নয়টা লেখা হয়েছে।"

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

"দূর হয়েছে কয়টা?"

"সাতাশটার মতো। তুই এসেছিস এখন তোকে দিয়ে কাল আটাশ নম্বরটা ট্রাই করব।"

"সেটা কী?"

"পিঁপড়া খেলে নাকি মানুষ সাঁতার শেখে। কাল দুই-এক ডজন পিঁপড়া খেয়ে পানিতে লাফ দিবি।"

"আমি কেন?"

"আর কে পিঁপড়া খেতে রাজি হবে? মনে নেই তুই ছোট থাকতে কিল মেরে পিঁপড়াকে আধমরা করে টপ করে খেয়ে নিতি?"

"ছোট থাকতে মানুষ তো কত কীই করে—কাপড়ে পেশাব করে দেয়! তাই বলে—"

কথা শেষ করার আগেই ঝুমুর আপু আবার আমার চুলের গোছা ধরে ফেলল।

ঝুমুর আপুর এই ধরনের শারীরিক নির্যাতনের পরেও ছোট খালার বাসায় আমার খুব চমৎকার সময় কাটতে লাগল। পরীক্ষা শেষ, পড়াশোনার চিন্তা নেই—যা ইচ্ছে তা-ই করা যায়। ঝুমুর আপু আগেও একটু পাগলাটে ধরনের ছিল, এখন পাগলামো আরও বেড়ে গেছে। বাবু তাকে ঝুম্পু বলে ডাকে। প্রথমবার শুনে আমি অবাক হয়ে বললাম, "ঝুম্পু? সেটা আবার কী?"

বাবু দাঁত বের করে হেসে বলল, "ঝুমুর নামের আপু—ঝুম্পু। মধ্যপদলোপী তৎপুরুষ।"

বাবুর দেখাদেখি আমিও ঝুমুর আপুকে ঝুম্পু নামে ডাকতে শুরু করলাম, প্রথম প্রথম চোখ পাকিয়ে তাকালেও শেষে মেনে নিল।

সিলেট শহরের আশেপাশে বেড়ানোর জন্যে অনেক রকম মজার মজার জায়গা আছে। টিলা, চা-বাগান, ঝরনা, বিশাল হাওর। বেড়াতে এসেছি বলে ছোট খালু সব জায়গায় যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। মাইক্রোবাসে করে যাই, সাথে থাকে খাওয়ার প্যাকেট, পানির বোতল, মাথায় টুপি, পকেটে ক্যামেরা—একেবারে স্ফূর্তির ফাটাফাটি অবস্থা।

মনে হয় সব ভালো জিনিসেরই শেষ থাকে, আমাদের এই ঘুরে বেড়ানোর আনন্দেরও শেষ ঘনিয়ে এল। একদিন ভোরবেলা জামশেদ মামা এসে হাজির হলেন।

www.MurchOna.com

জামশেদ মামা হচ্ছেন আমার মায়ের চাচাতো ভাই, পৃথিবীতে তাঁর থেকে নীরস খুঁতখুঁতে এবং খিটখিটে মেজাজের আর কোনো মানুষ আছে বলে আমার জানা নেই। জামশেদ মামা পৃথিবীর একটি জিনিসকেও এখন পর্যন্ত ভালো বলেন নি, সবকিছুর মাঝেই তিনি কোনো-না-কোনো দোষ খুঁজে পান। আমি একেবারে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি জামশেদ মামার কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে দেখা হলে ভুরু কুঁচকে বলতেন, "রবীন্দ্রনাথ সাহেব, সোনার বাংলা গানটা কীরকম একটা গান হল? জাতীয় সঙ্গীতের জন্যে আরও তালের একটা গান লিখতে পারলেন না?" বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা হলে বলতেন, "সাতই মার্চের ভাষণটা বেশি সুবিধের হয় নাই, গ্রামারে গোলমাল আছে।" শুধু তা-ই না, হাসরের ময়দানেও নিশ্চয়ই খোদাকে বলে বসবেন, "খোদা, পৃথিবীটাকে গোল না করে যদি চ্যাপটা করে তৈরি করতে মনে হয় ভালো হত!"

এই হচ্ছে আমাদের জামশেদ মামা। সব সময় নাক চোখ মুখ কুঁচকে রেখেছেন। যেটাই দেখছেন সেটা দেখেই বিরক্ত হচ্ছেন এবং রেগে যাচ্ছেন। শুধু এটা হলে আমাদের কোনো অসুবিধে ছিল না, কিন্তু আমাদের বিপদ এল অন্যদিক দিয়ে। আমরা যখন নানা জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছি তখন সাথে একজন বড় মানুষ হিসেবে জামশেদ মামাকে জুড়ে দেওয়া শুরু হল। ঘুরে বেড়ানোর পুরো আনন্দটা মাটি হয়ে গেল আমাদের।

একদিন আমরা জাফলং বেরাতে গেলাম, সিলেট শহর থেকে দুই ঘণ্টার রাস্তা। জামশেদ মামা সাথে থাকবেন বলে আমরা যেতেই চাচ্ছিলাম না, কিন্তু পরে শুনলাম জায়গাটা খুব সুন্দর, একেবারে বর্ডারের কাছে, পাহাড়ি ঝরনা আর নদী। সব শুনে শেষ পর্যন্ত আমরা যেতে রাজি হলাম।

মাইক্রোবাস যাচ্ছে, আমি, ঝুম্পু আর বাবু পিছনে বসে রাস্তার মানুষগুলিকে নিয়ে একটা খেলা আবিষ্কার করছি তখন জামশেদ মামা মনে হয় সময় কাটানোর জন্যে আমাদের সাথে কথা বলা শুরু করলেন। আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এই ইয়ে তোমার নাম যেন কী?"

মামা সব সময় ভান করেন আমাদের মতো তুচ্ছ মানুষদের নাম তাঁর মনে থাকে না। আমি বললাম, "রাজু।"

"অ। কোন ক্লাসে পড়?"

এটাও আগে বলা হয়েছে, তবু আবার বলালাম, "ক্লাস এইটে উঠব।"

মামা নাক কোঁচকালেন যেন আমার শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হয়েছে, তারপর মাথা নেড়ে বললেন, "এত বড় ধামড়া ছেলে ক্লাস এইটে? আমি তোমার বয়সে এস. এস. সি. দিয়েছি।"

www.MurchOna.com

রাগে আমার পিত্তি জ্বলে গেল, ছোট থাকতে একটা ডাবল প্রমোশান পেয়েছিলাম বলে বয়স অনুযায়ী আমি এক ক্লাস উপরে। কিন্তু মামাকে সেই কথা বলার ইচ্ছাও হল না। জামশেদ মামা এবারে উদাস চোখে ঝুম্পুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কোন ক্লাসে?"

ঝুম্পু প্রথমে না শোনার ভান করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। মামা দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করতেই সে এক ক্লাস বাড়িয়ে বলল, "ক্লাস টেনে।"

মামা ভুরু কুঁচকে বললেন, "সেদিন যে বললে ক্লাস নাইন?"

ঝুম্পু দাঁত বের করে হাসার ভান করে বলল, "দেখছিলাম আপনার মনে আছে কি না।"

মামা খোঁচাটাকে সহজভাবে নিলেন না। খানিকক্ষণ চোখ কুঁচকে ঝুম্পুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তেমাদের স্কুলে আজকাল পড়াশোনা হয়?"

ঝুম্পু ঘাড় বাঁকা করে বলল, "হয়।"

"কী পড়ায়?"

"ইংরেজি বাংলা অঙ্ক এইসব।"

জামশেদ মামা ঠোঁটটা একটু কোঁচকালেন। মামার চেহারাটা মনে হয় খারাপ না, কিন্তু আমরা তাঁকে দুচোখে দেখতে পারি না বলে তাঁকে দেখতে আমাদের কাছে বিচ্ছিরি লাগে। ফরসা তেলতেলে মুখ, নাকের নিচে লালচে গোঁফ, মোটা ঠোঁটের আড়ালে কালচে জিব। মামা জিব দিয়ে ঠোঁট চেটে বললেন, "আজকাল কি আর স্কুলে পড়াশোনা হয়? আমাদের সময় যারা এস. এস. সি.-তে ফেল করত তারাও আজকালকার বি. এ. এম. এ. থেকে বেশি ইংরেজি জানত।"

ঝুম্পু বুঝে ফেলার ভান করে বলল, "তা তো হতেই পারে। তখন ব্রিটিশরা শাসন করত, ইংরেজির উপর জোর ছিল অনেক বেশি।"

জামশেদ মামা একটু রেগে উঠে বললেন, "ব্রিটিশরা ছিল ফর্টি সেভেনের আগে। তোমাদের ইতিহাস পড়ায় না?"

"পড়ায়।" ঝুম্পু চোখেমুখে একটা উদাস ভাব ফুটিয়ে বলল, "আমি ভেবেছিলাম আপনি ব্রিটিশ আমলের মানুষ। অনেক বয়স্ক দেখায় তো!"

মামা এবারে মুখ ভোঁতা করে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। মুখে হাত বুলালেন, গোঁফে হাত বুলালেন, চুল টেনে দেখলেন—মনে হয় সত্যি তাঁকে এত বুড়ো দেখাচ্ছে কি না পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন। শেষে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "এই দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। দেশটা আস্তে আস্তে ডুবে যাবে।"

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

ঝুম্পু ঘাড় বাঁকা করে জিজ্ঞেস করল, "কিসে ডুবে যাবে?"

মামা উত্তর দেওয়ার আগেই বাবু তার চিপসের প্যাকেট থেকে এক খাবলা চিপস মুখে দিয়ে বলল, "বন্যার পানিতে। তা-ই না মামা?"

মামা খুব তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "না। দেশ ডুবে যাবে গুণ্ডামিতে আর চুরি-ডাকাতিতে।"

ঝুম্পু আবার ঘাড় বাঁকা করে বলল, "আপনাদের সময় দেশে চোর-গুণ্ডা ছিল না? শুধু ছোট ছোট মহাপুরুষেরা ছিল?"

মামা গলার স্বর মোটা করে অনেকটা বাংলা নাটকের নায়কদের মতো গলা করে বললেন, "আমরা মুক্তিযুদ্ধের সময়ের মানুষ। আমাদের মতো দেশপ্রেম, ত্যাগ—"

ঝুম্পু ঝট করে ঘুরে বলল, "আপনি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?"

মামা আমতা-আমতা করে বললেন, "সেই সময় সবাই ছিল মুক্তিযোদ্ধা।"

"কিন্তু আপনি কী ছিলেন? ট্রেনিং নিয়ে এসে যুদ্ধ করেছেন?"

"ইয়ে মানে—"

বাবু মুখে আরও এক খাবলা চিপস পুরে দিয়ে কড়মড় করে খেতে খেতে বলল, "নিশ্চয় ছিলেন। দেখছ না মামার মিলিটারিদের মতো মোচ। তা-ই না মামা?"

মামা দুর্বলভাবে মাথা নাড়লেন। ঝুম্পু তখন সোজা হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কত নম্বর সেক্টরে ছিলেন?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনার কমান্ডার কে ছিল?"

বাবু জিজ্ঞেস করল, "আপনার মেশিনগান আছে মামা?"

জামশেদ মামার মুখ কালো হয়ে উঠল, চোখ লাল হয়ে উঠল। নাক মোটা করে হঠাৎ বাজখাঁই একটা ধমক দিয়ে বললেন, "আমার সাথে ফাজলেমি? একেবারে কান ধরে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেব।"

ঝুম্পু হঠাৎ মরিয়া হয়ে বলল, "কিন্তু আপনি কি সত্যিই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?"

রাগে মামার চেহারা খারাপ হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, "ছিলাম।"

"সত্যি?"

মামা চিৎকার করে বললেন, "আমি কি মিথ্যা কথা বলছি? আমি কি তোদের সাথে মশকরা করব? তোদের মতো আমরা কি নীতিহীন মানুষ? পাজি আর বেয়াদপ? আমরা কি ফাজিল ইতর ছোটলোক?"

www.MurchOna.com

মামা খুব খারাপভাবে গালিগালাজ করতে লাগলেন। ভাগ্যিস গাড়ি চলছে, নাহয় গাড়ি ঘিরে মানুষের ভিড় জমে যেত। মামার এরকম গালিগালাজ শুনে ঝুম্পু এবং আমরা চুপ মেরে গেলাম।

জাফলং ভ্রমণটা আমাদের একেবারে মাটি হল। আমরা রওনা দিয়েছি দেরি করে, পৌঁছাতে পৌঁছাতে অনেক দেরি হল। জায়গাটার সৌন্দর্যের অনেক বর্ণনা শুনেছি, কিন্তু গিয়ে দেখি শত শত ট্রাক পাথর তুলে আনছে, নদীতে নৌকার ভিড়, সেখানে হাজার হাজার মানুষ নদী থেকে ছেঁকে ছেঁকে বালু বের করছে। নদীতীরে ছোট ছোট দোকান, সেখানে স্মাগল করে আনা জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে।

জামশেদ মামাকে দেখলাম স্মাগল করে আনা জিনিসে খুব শখ, দোকান থেকে দোকান ঘুরে ঘুরে আফটার শেভ লোশান সাবান এইসব জিনিস খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন।

আমরা ফিরে যাওয়ার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়েছিলাম, কিন্তু জামশেদ মামার জন্যে খুব দেরি হল। যখন রওনা দিয়েছি তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। মাইক্রোবাসে আমরা চুপ করে বসে আছি, বাইরে অন্ধকার, সরু রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলছে। মামা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন তাঁর সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। সামনে কিছু দোকানপাট দেখে সেখানে গাড়ি থামানো হল, মামার সাথে আমরাও নামলাম। মামা সিগারেট কিনলেন, আমি কিনলাম চিউয়িংগাম, তখন একজন জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি বেড়াতে এসেছ?"

আমরা মাথা নাড়লাম। মানুষটা বলল, "তেমারা কি রানি ইরাবতীর বেদি দেখেছ?"

"না।" ঝুম্পু জিজ্ঞেস করল, "কী আছে সেখানে?"

"নরবলি হত সেখানে।"

"নরবলি?" আমি শিউরে উঠে বললাম, "সর্বনাশ!"

জামশেদ মামা শুকনো গলায় বললেন, "কখন হত?"

"এই শতাব্দীতেও হয়েছে। খাসিয়া রানি ছিল ইরাবতী।"

'নরবলি দিত কেন?"

"রানির খেয়াল। অপরাধীদের শাস্তি দিত সেটাও বলে কেউ-কেউ।"

ঝুম্পু বলল, "চলো জায়গাটা দেখে যাই।"

মানুষটা মাথা নেড়ে বলল, "আজকে রাত হয়ে গেছে। না যাওয়াই ভালো। তার উপর কৃষ্ণপক্ষের রাত।"

"কেন?"

www.MurchOna.com

"জায়গাটা খারাপ। অন্ধকারে যাওয়া ঠিক না।"

ঝুম্পু কৌতূহলী মুখে বলল, "কী হয় গেলে?"

"ভয় পায়। অনেক নরবলি হয়েছে তো—কিছু-একটা আছে। বিশেষ করে মেয়েদের যাওয়া একেবারেই ঠিক না। রানি ইরাবতীর প্রেতাত্মা নাকি ঘুরে বেড়ায়।"

শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, দেখলাম জামশেদ মামাও কেমন জানি শিটিয়ে উঠলেন, শুকনো গলায় বললেন, "দেরি হয়ে যাচ্ছে, চল বাসায় যেতে হবে।"

ঝুম্পু ঘাড় বাঁকা করে বলল, "আমি রানি ইরাবতীর বেদি না দেখে যাব না।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "কী বলছ তুমি ঝুম্পু? এত রাতে?"

"রাতই তো ভালো।"

জামশেদ মামা দুর্বল গলায় একটা হুংকার দিলেন, "বাসায় চল।"

ঝুম্পু ততক্ষণে মানুষটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রানি ইরাবতীর নরবলির বেদির খোঁজ নিয়ে সেদিকে হাঁটতে শুরু করেছে। আমি পিছুপিছু ছুটে গিয়ে বললাম, "কী পাগলামি করছ ঝুম্পু?"

ঝুম্পু মুখ শক্ত করে বলল, "আমি হচ্ছি কুদূদের চেয়ারপারসন—এইসব কুসংস্কার বিশ্বাস করি না। তোরা যেতে চাইলে আয় নাহয় আমি একলাই যাব।"

বাবু মুখ কাঁদোকাঁদো করে বলল, "যেও না ঝুম্পু।"

ঝুম্পু কারও কথা শুনল না, অন্ধকার পথ ধরে হাঁটতে শুরু করল। বাধ্য হয়ে আমরাও পিছুপিছু হাঁটতে থাকলাম। জামশেদ মামা কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছেন, নিচু গলায় গজগজ করছেন। আমি বললাম, "ভূত তো আর সত্যি নেই—এটা নিশ্চয়ই বানানো—"

"বানানো না হাতি! এরকম জিনিস কেউ বানিয়ে বলে?"

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, "তা হলে এটা কি সত্যি?"

"নিশ্চয়ই সত্যি। আমার ছোট ফুপু চুল খোলা রেখে বাঁশঝাড়ে গিয়েছিল। তখন—"

বাবু কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, "এখন বলবেন না মামা, ভয় করছে।"

মামা চুপ করে গেলেন।

রানি ইরাবতীর বেদিটা একটা দেওয়ালে ঘেরা জায়গার ভিতরে। বাইরে বিশাল কিছু চ্যাপটা ধরনের পাথর সাজানো আছে, দেখে মনে হয় অনেক মানুষ সেখানে বসে থাকত। পিছনে পাথরের দেওয়াল উঁচু করে রাখা।

www.MurchOna.com

সামনে একটা সরু গেট, সেটার ভিতর দিয়ে ভিতরে ঢুকেছি। ভিতরে আবছা অন্ধকার, সামনে অনেকটা জায়গা খালি একটা খোলা মাঠের মতো। তার সামনে একটা বড় গোলাকার পাথরের বেদি। এখানে নিশ্চয়ই মানুষকে এনে বলি দিত, জায়গাটা দেখেই আমার ভিতরে আতঙ্কের একটা শিহরন বয়ে গেল।

ঝুম্পু বেদিটা স্পর্শ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ এক লাফে বেদিটার উপরে উঠে দাঁড়ায়। জামশেদ মামা ভয়-পাওয়া গলায় বললেন, "এই ঝুমুর, ওখানে উঠেছিস কেন? নাম। নাম বলছি!"

ঝুম্পু বেদি থেকে নামল না। হেঁটে হেঁটে ঠিক মাঝখানে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। আমরা আবছা অন্ধকারে দেখতে পেলাম সে আকাশের দিকে মুখ করে তাকিয়েছে, তারপর হঠাৎ মাথার ফিতা টান দিয়ে চুলগুলি খুলে দিল। জামশেদ মামা শুকনো গালায় বললেন, "চুল খুলছে কেন? চুল—"

আমার হঠাৎ একধরনের ভয় হতে থাকে। আমি কাঁপা গলায় বললাম, "ঝুম্পু—এই ঝুম্পু!"

ঝুম্পু আমার কথার উত্তর দিল না। বাবু কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, "এই ঝুমুর আপু! কথা বল না কেন? আমার ভয় করছে।"

ঝুম্পু হঠাৎ অমানুষিক একধরনের গলায় খিলখিল করে হেসে ওঠে—আমরা সেই হাসি শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। জামশেদ মামা কাঁপতে কাঁপতে পকেট থেকে একটা ম্যাচ বের করে একটা কাঠি জ্বালানোর চেষ্টা করতেই ঝুম্পু চিলের মতো চিৎকার করে বলল, "না। খবরদার!" তারপর বিজাতীয় একধরনের আঞ্চলিক সুরে কী যেন বলতে বলতে মামার দিকে এগিয়ে আসে। মামার কাছাকাছি এসে হঠাৎ ঝুম্পু থেমে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, "রক্ত চাই।"

আমরা কোনো কথা বললাম না। ঝুম্পু আবার বলল, "রক্ত। রক্ত চাই। কতদিনের তৃষ্ণা আমার। দাও রক্ত দাও—"

ঝুম্পু তার চুল ছড়িয়ে বেদির উপরে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, "রক্ত। রক্ত।"

আমি শুকনো গলায় বললাম, "কে? তুমি কে?"

ঝুম্পু খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, "তুমি আমাকে চেন না? আমি রানি ইরাবতী।"

"ই-ই-ইরাবতী?"

"হ্যাঁ। আমার ডাকে তোমরা এসেছ এখানে। আমার রক্ত চাই। রক্ত।"

আমি ভাঙা গলায় বললাম, "কার রক্ত?"

www.MurchOna.com

"তোমাদের মাঝে যে মিথ্যাবাদী তার রক্ত। আসো, কাছে আসো। আমি গলায় কামড় দিয়ে শিরা ছিঁড়ে নেব—"

ঝুম্পুর মুখ থেকে হঠাৎ রক্ত শুষে নেবার শব্দ শোনা গেল, আমার সমস্ত শরীর জমে যায় আতঙ্কে। আমি ভয়ে মাথা নেড়ে বললাম, আমি না। আমি না—আমি মিথ্যা কথা বলি নাই—"

"কে বলেছ?" ঝুম্পুর গলা দিয়ে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা মেয়ের গলায় কে যেন চিৎকার করে উঠল, "কে বলেছে?"

জামশেদ মামা হঠাৎ ঝুপ করে হাঁটু ভেঙে পড়ে গেলেন। ভাঙা গলায় বললেন, "ক্ষমা চাই। ক্ষমা চাই রানি ইরাবতী। আমি মিথ্যা কথা বলেছি। আমি—"

"কী বলেছ তুমি?"

"আমি বলেছি আমি মুক্তিবাহিনী, আসলে—আসলে—"

ঝুম্পু হঠাৎ মুখ তুলে হিংস্র গলায় বলল, "আসলে কী?"

"আসলে আমি মুক্তিবাহিনী না। আমি ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস করেছি—"

ঝুম্পুর শরীরে রানি ইরাবতীর দেহ টানটান হয়ে দাঁড়াল। দুই হাত উপরে তুলে কী-একটা বলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে একেবারে স্বাভাবিক গলায় বলল, "কুদ্দুসের আটাশ নম্বর কুসংস্কার ভুল প্রমাণিত হল।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "কী? কী বললে?"

ঝুম্পু এক লাফে বেদি থেকে নেমে বলল, "এখানে মেয়েরা এলে তার উপর রানির প্রেতাত্মার বশ হয় সেটা পুরোপুরি গুলপট্টি।"

আমি তখনও বুঝতে পারছিলাম না—কোনোমতে বললাম, "ঝুম্পু! তুমি ঠিক আছ?"

"ঠিক থাকব না কেন? আমাদের স্কুলে রানি ইরাবতী নাটক হয়েছিল, সেখান থেকে অ্যাকটিং করে দেখালাম। ভালো হয়েছে না? গোল্ড মেডেল পেয়েছিলাম আমি। বাসায় গিয়ে মনে করিস, দেখাব।"

জামশেদ মামা তখনও হাঁটু গেড়ে মুখ হাঁ করে বসে আছেন। ঝুম্পু তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, "উঠুন মামা—এই জায়গাটা যা নোংরা, দিনের বেলা এলে বুঝবেন। আপনার প্যান্ট ময়লা হয়ে যাবে।"

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই খবর পেলাম জামশেদ মামা ভোরের ট্রেনে ঢাকা চলে গেছেন। তাঁর নাকি খুব একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়েছে।

ঝুম্পুকে তার গোল্ড মেডেলটা দেখাতে বলেছি, সে শুধু ধানাইপানাই করে, দেখাতে চায় না। কারণটা কী কে জানে!

www.MurchOna.com

গ্রাউল

গ্রাউল তার আরামদায়ক চেয়ারটিতে গা ডুবিয়ে বসেছিল। হাতের উত্তেজক পানীয়ের গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে সে নিচু গলায় ডাকল, "ক্রিটন!"

সামনের দেয়ালে চাপা একটি ঘরঘর শব্দ হচ্ছিল, শক্তিশালী পাম্প দিয়ে ক্রিটন-কম্পিউটারের প্রসেসরের ভিতর দিয়ে তাপপরিবাহী তরল পাঠানো হচ্ছে। দেয়ালে ইতস্তত কিছু বাতি জ্বলে এবং নিভে ওঠে এবং প্রায় সাথে সাথে ক্রিটন-কম্পিউটার তার আধাযান্ত্রিক গলায় বলল, "আমাকে ডেকেছেন মহামান্য গ্রাউল?"

"হ্যাঁ। আমার হিসেবটা একটু বের করো।"

গ্রাউল একজন বস্ত্রশিল্প ব্যবসায়ী—গ্রাউল গার্মেন্টস নামে তার পৃথিবীজোড়া ব্যাবসা। গত দুই বছরে তার ব্যাবসা বাড়াবাড়ি রকম ফুলেফেঁপে উঠেছে।

ক্রিটন কাছাকাছি একটা হলোগ্রাফিক স্ক্রীন খুলে সেখানে গ্রাউলের ব্যাবসার হিসেবপত্র দেখাতে শুরু করে। গ্রাউল এক নজর দেখে অধৈর্য হয়ে বলল, "আহ্! এই হিসেব না, অন্যটা।"

"কিন্তু মহামান্য গ্রাউল, অন্য হিসাবটি অসত্য। সেটি রাষ্ট্রের আইনভঙ্গকারী প্রক্রিয়ায় তৈরি। সেটি—"

গ্রাউল তার আরামদায়ক চেয়ারে সোজা হয়ে বসে পাশের টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, "আমাকে তোমার নীতিকথা শোনাতে হবে না। আমি জানি আমি কী করছি।"

"মহামান্য গ্রাউল—" ক্রিটন-কম্পিউটার তার স্বভাবসুলভ শান্ত স্বরে বলল, "আপনি যদি এই অসত্য হিসেবটি ব্যবহার করেন তা হলে আইন

www.MurchOna.com

ভঙ্গ করার অপরাধে আপনার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে।"

গ্রাউল মুখ খিঁচিয়ে অত্যন্ত রূঢ়কণ্ঠে বলল, "তোমাকে সেটা নিয়ে ভাবতে হবে না। কী করলে আইন রক্ষা হয় এবং কী করলে আইন ভঙ্গ হয় সেটা আমি তোমার চাইতে ভালো করে জানি।"

"আপনি জানেন না মহামান্য গ্রাউল—"

"ব্যস!" গ্রাউল চিৎকার করে বলল, "অনেক হয়েছে। এবারে হিসেবটা বের করো।"

ক্রিটন বলল, "সেটিই যদি আপনার আদেশ হয়ে থাকে তা হলে দেখুন।"

প্রায় সাথে সাথেই গ্রাউলের কাছাকাছি হলোগ্রাফিক স্ক্রীনে তার বস্ত্রব্যবসায়ের হিসেবটুকু বের হয়ে আসে। গ্রাউল গত বছরের লাভের অঙ্কের সাথে আগামী বছরের সম্ভাব্য লাভটুকু যোগ করে বিশেষ পুলকিত হয়ে ওঠে। জিব দিয়ে মুখের ভিতরে শিস দেওয়ার মতো শব্দ করে গ্রাউল উৎফুল্ল গলায় বলল, "খারাপ না! কী বল ক্রিটন?"

"কিন্তু এটা অসত্য।"

"কোন জায়গাটা অসত্য?"

"এই যে আপনি আগামী বছরের সম্ভাব্য লাভ হিসেবে যে-পরিমাণটুকু দেখছেন সেটি সত্যি নয়। দুই বিলিওন ট্রাউজার এবং শার্টের জন্যে নিম্নশ্রেণীর পলিমার ব্যবহার করা হয়েছে। ট্রাউজার এবং শার্ট তৈরি করার পর সেগুলি সংরক্ষণের সময় যে-উত্তাপ দেওয়া হয় সেই উত্তাপে সেগুলি অন্তত দশ শতাংশ ছোট হয়ে গেছে। কাপড়গুলি আনুমানিকভাবে দশ সেন্টিমিটার ছোট। মানুষ কখনোই তার আকৃতি থেকে পরিমাণে ছোট কাপড় পরিধান করে না।"

গ্রাউল হাহা করে হেসে বলল, "তুমি ঠিকই বলেছ ক্রিটন।"

"তা হলে আপনি কীভাবে এইসকল ট্রাউজার এবং শার্ট বিক্রি করার কথা ভাবছেন? সেগুলি দশ সেন্টিমিটার ছোট।"

"যারা কিনবে তারাও দশ সেন্টিমিটার ছোট হয়ে যাবে।"

ক্রিটন-কম্পিউটার নিচু এবং শান্ত গলায় বলল, "আপনি কী বলছেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"তুমি কি বিজানন এনজাইমের নাম শুনেছ?"

ক্রিটন-কম্পিউটার এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে তার তথ্যকেন্দ্র পরীক্ষা করে বলল, "জানি মহামান্য গ্রাউল। এই এনজাইমটি মানুষের উচ্চতাসংক্রান্ত জিনটির একটি অপ্রতিরোধ্য বিচ্যুতি ঘটিয়ে দেয়।"

www.MurchOna.com

"হ্যাঁ।" গ্রাউল খিকখিক করে হেসে বলল, "মানুষের শরীরে এই এনজাইম পরিমাণমতো প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাদের উচ্চতা রাতারাতি দশ সেন্টিমিটার কমিয়ে আনা যায়।"

ক্রিটন-কম্পিউটার গম্ভীর গলায় বলল, "মাহমান্য গ্রাউল, এটি শুধু যে অন্যায়, আইন এবং নীতিবিরুদ্ধ তা-ই নয়, এটি মানুষের জন্যে বিপজ্জনক।"

গ্রাউল আবার হাহা করে উচ্চস্বরে হেসে বলল, "ন্যায়-অন্যায় খুব আপেক্ষিক ব্যপার। আর বিপদের কথা বলছ, জীবনটাই তো বিপজ্জনক।"

"যদি ধরে নিই আপনার কোম্পানির ছোট হয়ে যাওয়া জামা-কাপড় বিক্রি করার জন্যে পৃথিবীর মানুষকে দশ সেন্টিমিটার ছোট করা প্রয়োজন এবং সেজন্যে সবার শরীরের বিজানন এনজাইম ঢোকানো প্রয়োজন—"

"হ্যাঁ। তা হলে কী?"

"তা হলে আমার প্রশ্ন, আপনি সেটি কী করে করবেন? পৃথিবীর মানুষ কেন আপনাকে তাদের শরীরে বিজানন প্রবেশ করাতে দেবে?"

গ্রাউল একটি চোখ ছোট করে তার পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, "তুমি কি ভাবছ ঢাকঢোল পিটিয়ে হৈচৈ করে পৃথিবীর মানুষের শরীরে বিজানন এনজাইম প্রবেশ করানো হবে?"

"তা হলে?"

"কাজটি করা হবে গোপনে। তাদের অগোচরে।"

"অগোচরে?"

"হ্যাঁ।"

"মহামান্য গ্রাউল—" ক্রিটন থমথমে গলায় বলল, "কাজটি ঘোরতর অন্যায়—আমি তবুও জানতে চাইছি সেটি কীভাবে করা হবে।"

গ্রাউল উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে বলল, "নবম মাত্রার কম্পিউটার হিসেবে তুমি নেহায়েত সাদাসিধে ধরনের।"

"সম্ভবত।"

"তুমি নিশ্চয়ই জান সম্প্রতি আমি শীতল পানীয় ব্যাবসায় প্রবেশ করেছি। পৃথিবীর একটি অন্যতম জনপ্রিয় পানীয়-কোম্পানি কিনে নিয়েছি।"

"জানি মহামান্য গ্রাউল। ব্যবসায়িক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে সেটি একটি অলাভজনক বিনিয়োগ ছিল।"

"সাময়িকভাবে তা-ই মনে হতে পারে।" গ্রাউল তার পানীয়ের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, "কিন্তু বিজানন এনজাইম শরীরে প্রবেশ করানোর জন্যে এর থেকে সহজ উপায় কী হতে পারে? আমার নিজের ফ্যাক্টরিতে পানীয়ের সাথে মিশিয়ে দেওয়া হবে।"

www.MurchOna.com

"কিন্তু মহামান্য গ্রাউল—"

"কাঁচামাল রপ্তানিকারককে কীভাবে ফাঁসানো হবে সেটিও ঠিক করে রাখা আছে। সেটা তোমাকে বলে লাভ নেই। তোমার হার্ডওয়ার অনেক উন্নত মানের হতে পারে, কিন্তু তুমি অপ্রচলিত কৌশল বোঝ না—"

"শব্দটি সম্ভবত অন্যায় কিংবা নীতিবিরুদ্ধ।"

"একই কথা।"

"কিন্তু তার উদ্দেশ্যটা কী?"

"উদ্দেশ্য আদি এবং অকৃত্রিম টাকা। পৃথিবীটা কার? পৃথিবী টাকার।" গ্রাউল যেন অত্যন্ত উঁচুমানের রসিকতা করেছে সেভাবে হেসে উঠল।

ক্রিটন-কম্পিউটার তার হাসি থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করে নিচু গলায় বলল, "কিন্তু আপনার তো অনেক টাকা!"

"আমার আরও চাই।"

"আরও কত চাই?"

"সেটা কি আর আগে থেকে বলা যায়? আরও অনেক চাই।"

ক্রিটন-কম্পিউটার একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতো শব্দ করল। তাকে মানুষের অনুকরণে কথা বলার জন্যে অত্যন্ত চমৎকারভাবে প্রোগ্রাম করা হয়েছে।

গ্রাউল হলোগ্রাফিক স্ক্রীনে তার বিশাল টাকার পরিমাণ পর্যবেক্ষণ করতে করতে মুখ দিয়ে একটি আরামদায়ক শব্দ বের করল, টাকার অঙ্ক নাড়াচাড়া করতে তার খুব ভালো লাগে। খানিকক্ষণ সংখ্যাগুলি দেখে সে তার নরম চেয়ারে হেলান দিয়ে আবার গা ডুবিয়ে বসে বলল, "ক্রিটন!"

"বলুন মহামান্য গ্রাউল।"

"আমার সব টাকা দিয়ে হীরা কিনে রাখবে। এমনি টাকাকে বিশ্বাস নেই—তার দাম ওঠানামা করে। হীরা হচ্ছে নিরাপদ বিনিয়োগ।"

"কিনব মহামান্য গ্রাউল।"

"বড় বড় হীরা। কমপক্ষে একশো ক্যারটের সাইজ। বুঝেছ?"

"বুঝেছি।"

"আমার জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সবচেয়ে বড় হীরাটি কিনে ফেলা।"

"সেটি কত বড়?"

"আমার সমান ওজন। সাউথ আফ্রিকার হীরকখনি থেকে বের হয়েছে, স্মিথসনিয়ান মিউজিয়ামে আছে।"

"সেটি অসম্ভব মূল্যবান। আপনি এই মুহূর্তে সেটা কিনতে পারবেন না।"

www.MurchOna.com

"জানি। সেইজন্যেই আমার আরও অনেক টাকার দরকার। একজন মানুষ যখন দাবি করতে পারে সে তার শরীরের সমান ওজনের হীরা কিনতে পারে তখন বুঝতে হবে সেই মানুষটি সফল। আমি সফল মানুষ হতে চাই ক্রিটন।"

"সাফল্যের আরও অন্যরকম সংজ্ঞা আছে মহামান্য গ্রাউল।"

"থাকুক। আমার সংজ্ঞা আমার কাছে। আমি আমার শরীরের সমান ওজনের হীরা কিনতে চাই। পৃথিবীকে দেখাতে চাই একজন মানুষ তার নিজের চেষ্টায় এত টাকা উপার্জন করতে পারে যে সে তার শরীরের সমান ওজনের হীরা কিনতে পারে।"

"মহামান্য গ্রাউল!"

"বলো।"

"আপনার এই ধরনের শখ কেন হয়েছে?"

"ইতিহাস পড়ে। প্রাচীনকালে সম্রাটদের সম্মান দেখানোর জন্যে তাদের শরীরের সমান ওজনের সোনা উপহার দেওয়া হত। তারা সুদৃশ্য একটা দাঁড়িপাল্লার এক পাশে বসে থাকতেন, অন্য পাশে প্রজারা সোনা দিতে থাকত। যখন সোনার পরিমাণ তার ওজনের সমান হয়ে যেত তখন দাঁড়িপাল্লা তাকে উপরে তুলে আনত। প্রজারা তখন আনন্দধ্বনি করত। একটা হাস্যকর পদ্ধতি—কিন্তু কার্যকর।"

"আপনিও সেই একই ব্যাপার করতে চান?"

"হ্যাঁ। তবে স্বল্পমূল্যের সোনা দিয়ে নয়। হীরা দিয়ে।"

"যদি এটা করতে পারেন তা হলে আপনিও টাকা উপার্জন বন্ধ করবেন?"

গ্রাউল হাহা করে হেসে বলল, "মনে হয় করব। একসময় তো থামতে হবে। কী বল?"

ক্রিটন কম্পিউটার কোনো কথা বলল না।

"কয়টা বাজে ক্রিটন?"

"অনেক রাত হয়েছে মহামান্য গ্রাউল। এখন বাজে রাত বারোটা। আপনার সম্ভবত শুয়ে পড়া উচিত।"

"হ্যাঁ, শুয়ে পড়ি।" গ্রাউল তার নরম চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

বিশাল ধবধবে বিছানায় শুয়ে গ্রাউল তার মাথার কাছে রাখা ক্রিস্টালের সুদৃশ্য গ্লাস হাতে নিয়ে পানীয়টাতে চুমুক দেয়। তার সুনিদ্রার জন্যে এই

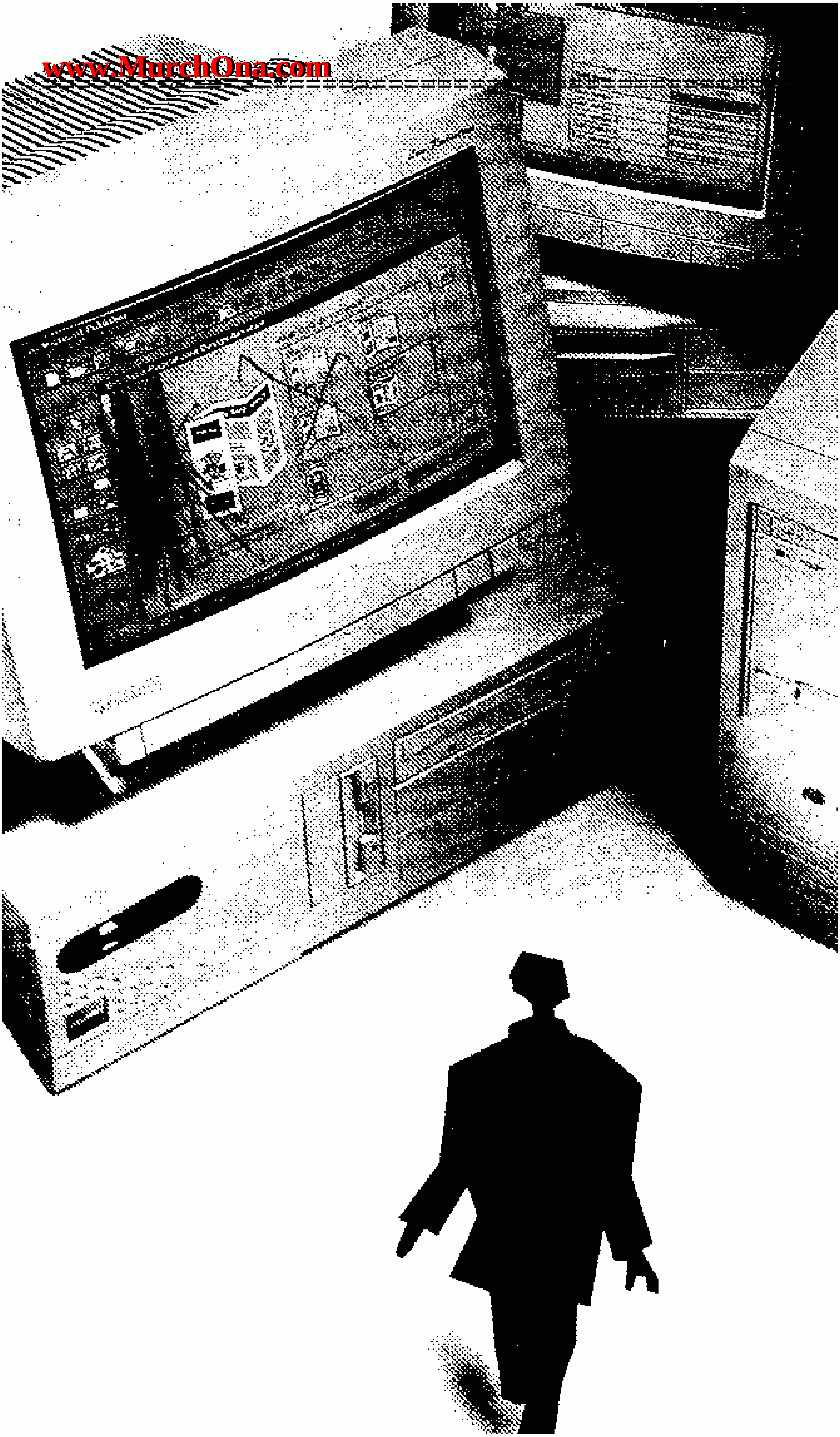

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

পানীয়তে নানা ধরনের জৈব এবং অজৈব উপাদান দ্রবীভূত আছে। ক্রিটন-কম্পিউটার তার শরীরকে বিশ্লেষণ করে এই উপাদানগুলি ঠিক করে দেয়। মনে হয় এজন্যেই এই বয়সেও তার শরীর এরকম চমৎকার।

পানীয়টাতে ঝাঁজালো একধরনের গন্ধ। এক চুমুক খেতেই সারা শরীরে আরামদায়ক উষ্ণতা ছড়িয়ে পড়ে। গ্রাউল তৃপ্তির একটা শব্দ করে আরেক চুমুকে পানীয়টা শেষ করে নেয়। প্রায় সাথে সাথেই তার চোখে মধুর একধরনের ঘুম নেমে আসে। চোখ বন্ধ করার আগে সে ক্রিটন-কম্পিউটারের গলার স্বর শুনতে পেল, "শুভ রাত্রি মহামান্য গ্রাউল।"

"শুভরাত্রি।"

"আপনার আনন্দময় নিদ্রা হোক।"

গ্রাউল উত্তরে কিছু বলার আগেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল।

ঘুম ভাঙার পর চোখ খুলে গ্রাউলের মনে হল কিছু-একটা ঠিক নেই। সে তার ধবধবে সাদা বিছানায় শুয়ে আছে, মাথার কাছে কারুকার্যময় টেবিল, ঘরে পরিচিত আসবাব, সুদৃশ্য নকশাকাটা ছাদ, দেওয়ালে দুষ্প্রাপ্য তৈলচিত্র, কিন্তু তবুও কোথাও যেন কিছু-একটায় গোলমাল রয়েছে। ঠিক কী জিনিসটায় গোলমাল সে বুঝতে পারল না। ভালো করে চোখ খুলে তাকিয়ে মনে হল সবকিছু যেন তার কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। গ্রাউল প্রায় ধড়মড় করে উঠে বসল, হঠাৎ করে মনে হল তার ধবধবে বিছানাটি খেলার মাঠের মতো বড়। মাথার কাছে টেবিলটি কাছে থেকেও অনেক দূরে, অনেক বিশাল। ঘরের ছাদ অনেক উঁচুতে, দুষ্প্রাপ্য তৈলচিত্রগুলি অনেক উঁচু থেকে ঝুলছে। কী হচ্ছে চারিদিকে?

গ্রাউল ভয়-পাওয়া গলায় ডাকল, "ক্রিটন!"

দেওয়ালে কিছু বাতি জ্বলে উঠল এবং ক্রিটন-কম্পিউটার তার আধাযান্ত্রিক গলায় বলল, আমাকে ডেকেছেন মহামান গ্রাউল?"

"কী হচ্ছে এখানে? সবকিছু এরকম মনে হচ্ছে কেন?"

"আপনি ছোট হয়ে গেছেন মহামান্য গ্রাউল।"

"কী বললে?"

"আপনার পানীয়ের সাথে গতরাতে নয় মিলিগ্রাম বিজানন এনজাইম মিশিয়ে দিয়েছি। এই পরিমাণ এনজাইম আপনার দেহের আকৃতিকে কমিয়ে এক ফুটের কাছাকাছি নিয়ে আসবে।"

"কী বললে? কী—কী—"

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

"আপনার জীবনের উদ্দেশ্য সফল করে দিয়েছি মহামান্য গ্রাউল। আপনার ওজন এখন মাত্র দেড় কেজি। আপনার অর্থ দিয়ে আপনি এখন আপনার সমান ওজনের একাধিক হীরা কিনতে পারবেন।"

গ্রাউল নিজের দিকে তাকাল, সামনে আয়নাতেও সে নিজেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, সত্যি সত্যি সে ছোট হয়ে গেছে। একটা খেলনা-পুতুলের মতো। ভয়ংকর আতঙ্কে সে চিৎকার করে ওঠে।

ক্রিটন-কম্পিউটার নিচু গলায় বলল, "মহামান্য গ্রাউল, আপনার বর্তমান ওজনের কয়েকটি হীরা আছে। আপনি কোনটা কিনতে চান?"

গ্রাউল আবার একটা চিৎকার করে ওঠে। বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তার পা পিছলে যায়, বিছানার নিচে পড়তে গিয়ে সে কোনোভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে বিছানার চাদর ধরে ঝুলে পড়ল। গ্রাউল সেই অবস্থায় আতঙ্কে তার দুই পা ছুড়তে থাকে।

দেড় কেজি ওজনের একজন ন্যাংটা মানুষ বিছানার চাদর ধরে ঝুলছে—দৃশ্যটি অত্যন্ত হাস্যকর। ক্রিটন কম্পিউটারের মাঝে হাসির অনুভূতি দেওয়া হয় নি বলে সে অবিশ্যি সেটি ধরতে পারল না। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে সে গ্রাউলের জন্যে কিছু হীরা বাছতে শুধু করল।

www.MurchOna.com

শকসো

ঢাকা থেকে জরুরি কাজে সিলেট যাব, তাড়াহুড়ো করে এয়ারপোর্টে এসে শুনি ফ্লাইটটা দুই ঘণ্টা পিছিয়ে দিয়েছে। আমার মতো আরও অনেক যাত্রী বিরস মুখে বসে আছে—প্লেনের যাত্রীরা একটু ভদ্রগোছের বলে মনে হয়, না হলে এতগুলো মানুষকে এক কথায় দুই ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়ার পরও কোনো চ্যাঁচামেচি হৈচৈ নেই, ঝগড়াঝাঁটি বাগ্‌বিতণ্ডা নেই।

এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসে হাতের খবরের কাগজটা প্রায় মুখস্থ করে ফেললাম। কাগজের চতুর্থ এবং পঞ্চম পৃষ্ঠায় মফস্বলের অনেক খবর থাকে। মফস্বলে ভালো কিছু ঘটে বলে মনে হল না, বেশির ভাগই খুন-জখম এবং অ্যাসিড মারার গল্প, প্রথম এক-দুই লাইন পড়ে আর বিস্তারিত পড়ার ইচ্ছা করে না। কাগজটা ভাঁজ করে রেখে দেখলাম আমার পাশে মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ বসে আছেন। আমার চোখে চোখ পড়তেই একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "সিলেট যাচ্ছেন?"

"জি।"

"প্লেন কেন লেট হয়েছে জানেন?"

"না।"

"বিমানমন্ত্রী কলকাতা গিয়েছেন শাড়ি কিনতে।"

"শাড়ি কিনতে?"

"হ্যাঁ। শালীর বিয়ে।"

শাড়ি কেনার সাথে সিলেটে প্লেন লেট হবার সম্পর্ক কী আমি বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, "মন্ত্রী শাড়ি কিনলে আমাদের প্লেন লেট হবে কেন?"

www.MurchOna.com

"একটাই তো প্লেন। সেই প্লেন কলকাতা থেকে ফিরে আসবে, তারপর আমাদের নিয়ে সিলেট যাবে।"

আমি অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললাম, "সত্যি বলছেন?"

"সত্যি। একেবারে পাকা খবর। ফ্লাইট ম্যানেজার আমার বিশেষ বন্ধুমানুষ। সে খবর দিয়েছে। মন্ত্রীসাহেব তাঁর মিসেসকে নিয়ে বাজারে চলে গেছেন। ইন্সট্রাকশান দেওয়া আছে যতক্ষণ না ফিরে আসছেন ততক্ষণ প্লেনটাকে আটকে রাখতে হবে।"

আমি চোখ বড় বড় করে তাকালাম, ভদ্রলোক হাসিহাসি মুখ করে বললেন, "এত অবাক হচ্ছেন কেন? এরকমই তো চলছে। মোগল বাদশারা যেরকম সারা দেশের সবকিছুর মালিক ছিল আমাদের মন্ত্রীরাও তা-ই। তারা সবকিছুর মালিক!"

আমি মাথা নেড়ে একটা নিশ্বাস ফেলে সোজা হয়ে বসলাম। ভদ্রলোক চেয়ারে হেলান দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সিলেটে নূতন যাচ্ছেন।"

"না। সেখানেই থাকি।"

"সুন্দর জায়গা! বিউটিফুল!"

কথা বলার জন্যে কথা বলা। তাই আমাকেও ভদ্রতা করে কিছু-একটা জিজ্ঞেস করতে হয়। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কোথায় থাকেন?"

'বেশির ভাগ সময় ঢকাতেই থাকি। বাকি সময়টা চিটাগাং আর খুলনা। মাঝে মাঝে রাজশাহী সিলেট।"

"ও।" আরও কিছু জিজ্ঞেস করা যায় কি না ভাবছিলোম, তার মাঝে ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞেস করলেন, "কী করেন আপনি?"

"আমি পড়াই। ইউনিভার্সিটিতে।"

"ও! ভেরি গুড।" ভদ্রলোক এমনভাবে মাথা নাড়লেন যেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করা একটা সাংঘাতিক কাণ্ড! আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি?"

"আমি?" আমি এখন বিজনেস করি।"

"আগে অন্যকিছু করতেন?"

"হ্যাঁ। আগে ডাক্তার ছিলাম। সার্জন।"

"সার্জন?" আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "সার্জারি ছেড়ে দিলেন কেন?"

ভদ্রলোক উত্তর না দিয়ে তাঁর ডান হাতটা আমার সামনে এনে মেলে ধরলেন, আমি দেখলাম তাঁর বুড়ো আঙুলটা নেই, কেউ যেন নিখুঁতভাবে কেটে নিয়েছে। আমি একটু হকচকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "কোনো অ্যাকসিডেন্ট?"

www.MurchOna.com

"নাহ্।"

"তা হলে?"

"কেটে ফেলেছি।"

"কেটে ফেলেছেন? কোনোরকম ইনফেকশান?"

"উঁহুঁ। ইনফেকশান নয়। এমনিতেই কেটে ফেলেছি।"

"এমনিতেই কেটে ফেলেছেন? এমনি কেউ আঙুল কেটে ফেলে?"

"তা ঠিকই বলেছেন, খামোকা কে আঙুল কেটে ফেলবে? তাও বুড়ো আঙুল। সার্জনের বুড়ো আঙুল! কারণ অবিশ্যি একটা ছিল।"

আমি একটু কৌতূহল নিয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। নিজে থেকে না বললে কারণটা জানতে চাওয়া ভদ্রতা হবে কি না বুঝতে পারছিলাম না। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, "আপনি যদি শুনতে চান তা হলে বলতে পারি। গল্পটা এখনও কেউ বিশ্বাস করে না—আপনি যদি না চান আপনাকেও বিশ্বাস করতে হবে না।"

"কেন বিশ্বাস করব না?"

"শুনলেই বুঝতে পারবেন। যা-ই হোক—" বলে ভদ্রলোক তাঁর বুড়ো আঙুলবিহীন হাতটা সামনে তুলে সেটার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "আমার নাম মাহবুব খন্দকার।"

আমি নিজের নাম বলতেই তিনি করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন, আঙুলবিহীন হাত করমর্দন করতে আমার গা একটু কাঁটা দিয়ে উঠল, কেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভদ্রলোক এতক্ষণ বেশ হাসিহাসি মুখেই বসে ছিলেন, এবারে গল্প শুরু করার আগে হঠাৎ কেমন জানি একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

গল্পটা ছিল এরকম। তাঁর ভাষাতেই বলা যাক।

আমার জন্ম অক্টোবরের নয় তারিখ, সেটা হচ্ছে তুলারাশি। তুলারাশির মানুষেরা নাকি ভূত-প্রেত পরলোক এসব অলৌকিক জিনিসে উৎসাহী হয়। সেটা সত্যি কি না আমি জানি না, কিন্তু আমার আসলেই ভূত-প্রেত এসবে খুব উৎসাহ ছিল। কাউকে জিনে ধরেছে বা পরীতে বশ করেছে শুনলে আমি দেখতে যেতাম, বন্ধুদের সাথে বাজি ধরে পোড়োবাড়িতে রাত কাটিয়েছি, লাশকাটা-ঘরে ঘুরে বেড়িয়েছি। প্ল্যানচেট করেছি, চক্রে বসেছি, অমাবশ্যার রাতে শ্মশানে গিয়েছি, জিন বশ করার দোয়া-দরুদ পড়েছি, কিন্তু আমার কপালই হোক আর যা-ই হোক সত্যিকারের অলৌকিক কিছু কখনো দেখি নি। প্রায়-ভৌতিক অনেক কিছু আছে, কিন্তু সত্যিকারের ভৌতিক ব্যাপার যার ব্যাখ্যা নেই সেরকম কিছু একবারও দেখতে পেলাম না।

www.MurchOna.com

মেডিক্যাল কলেজে ভরতি হওয়ার পর ভূত-প্রেত কিংবা অলৌকিক জিনিসে আকর্ষণ খানিকটা কমে এল। অ্যানাটমি ক্লাসে বেওয়ারিশ লাশ কাটাকুটি করে আর ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে খুন-জখম অ্যাকসিডেন্টে মানুষকে মারা যেতে দেখে দেখে মন খানিকটা কঠোর হয়ে গেছে। তখন ভূত-প্রেত আর জিন-পরীতে আকর্ষণ বেশি থাকতে পারে না। তবুও আকর্ষণ যে একেবারে চলে গেল তা নয়, অলৌকিক জিনিসের গন্ধ পেলে একবার ঢুঁ মেরে আসতাম।

মেডিক্যাল কলেজ শেষ করে বিলেত গেলাম, সেখান থেকে এফ. আর. সি. এস. ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এসেছি। দেশে আমার তখন খুব রমরমা প্র্যাকটিস। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে প্রায় কশাইয়ের মতো মানুষকে কেটে ফেলি, ব্যাংকে টাকা রাখার জায়গা নেই। কয়েকটা ক্লিনিকের সাথে যোগাযোগ রয়েছে—দিনে দু-চারটে অপারেশন করতে হয়। একদিন গলব্লাডার স্টোনের জন্যে একজন মহিলাকে কাটব, ভদ্রমহিলা হঠাৎ কাতর স্বরে বললেন, "ডাক্তার সাহেব, আমাকে কেন কাটাকুটি করছেন? আমি তো বাঁচব না।"

আমি হাহা করে হেসে বললাম, "আমি কি এতই খারাপ সার্জন যে গলব্লাডার স্টোন সরাতে গিয়ে আপনাকে মেরে ফেলব?"

"সেটা নয়।" ভদ্রমহিলা ফিসফিস করে বললেন, "আমার আসলে ক্যান্সার হয়েছে।"

"ক্যান্সার?" আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, "আপনি কেমন করে জানেন?"

"আমাকে একজন বলেছে?

"যিনি বলেছেন তিনি কি ডাক্তার? বায়োপসি করেছে?"

"না।" ভদ্রমহিলা মাথা নাড়লেন, "তার কিছু করতে হয় না। এমনিতেই বলতে পারে।"

আমি খুব কষ্ট করে বিরক্তি গোপন করে বললাম, "যিনি আপনাকে এরকম একটা কথা বলেছেন তিনি খুব অন্যায় করেছেন। আমি আপনার পেট খুলছি—আপনাকে জানাব যে আপনার ক্যান্সার নেই।"

যাই হোক, অপারেশান টেবিলে পেট খুলে আমি একেবারে থ হয়ে গেলাম। সত্যি সত্যি ক্যান্সার—ভিতরে পুরোপুরি ছড়িয়ে পড়েছে, আমাদের কিছু করার নেই। আমি আবার বন্ধ করে ফিরে এলাম, তিনদিন পর ভদ্রমহিলা মারা গেলেন, মারা যাবার আগে তাঁর কাছ থেকে আমি সেই মানুষটার ঠিকানা নিয়ে রাখলাম।

কয়দিন পর ঠিকানা খুঁজে খুঁজে আমি সেই মানুষটাকে খুঁজে বের করেছি। পুরানো ঢাকার এক ঘিঞ্জি অন্ধগলিতে একটা ছোট অন্ধকার মশলার দোকানে উবু হয়ে বসে মশলা বিক্রি করছে। আধ্যাত্মিক মানুষের যেরকম চেহারা হওয়ার কথা তার চেহারা মোটেও সেরকম নয়। শুকনো তোবড়ানো গাল, কোটরাগত চোখ, থুতনিতে ছাগলের মতো দাড়ি, মাথায় তেলচিটাচিটে টুপি, গুনে গুনে ময়লা নোট ক্যাশবাক্সে রাখছে।

আমি পরিচয় দিয়ে বললাম, "আমি আপনার কাছে একটা কথা জানতে এসেছি।"

"রোগীর কথা জনতে এসেছেন? আমি কিন্তু শনি-রবিবার ছাড়া বলি না।"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "না, আমি রোগীর কথা জানতে আসি নাই। আপনি কেমন করে রোগীর কথা বলেন সেটা জানতে এসেছি।"

আমার কথা শুনে মানুষটা হঠাৎ মুখ শক্ত করে আমার দিকে রুক্ষ চোখে তাকাল। কঠোর গলায় বলল, "সেটা শুনে আপনি কী করবেন?"

"আমি জানতে চাই।"

"সব জিনিস সবাই জানতে পারে না। আপনি বাড়িতে যান।" বলে লোকটা আমাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে তার খরিদ্দারদের জন্যে জিরা ওজন করতে শুরু করল।

আমি অবিশ্যি হাল ছেড়ে দিলাম না, লোকটার পিছনে একেবারে চিনেজোঁকের মতো লেগে রইলাম। কখনো কাকুতি-মিনতি, কখনো ভয়-ভীতি, কখনো মিষ্টি কথা, কখনো শক্ত কথা কিছুই বাকি রাখলাম না। শেষ পর্যন্ত যে-জিনিসটা কাজে দিল সেটা হচ্ছে নগদ টাকা। আমি একবারও চিন্তা করি নি টাকা দিয়ে মানুষটাকে নরম করা যাবে, তা হলে প্রথম সেটা দিয়েই শুরু করতাম।

লোকটাকে নগদ দুই হাজার টাকা দেওয়ার পর টাকাগুলো গুনে ক্যাশবাক্সে রেখে বলল, "আমার পোষা শকসো আছে।"

"পোষা কী?"

"শকসো।"

"সেটা কী?"

"জিনের মতো কিন্তু জিন না। জিন তো আগুনের তৈরি, এটা আগুনের না। এইটা রক্তমাংসের। রক্ত খায়।"

"রক্ত খায়?"

"হ্যাঁ।"

www.MurchOna.com

"সেটা পায় কোনখানে?"

"শরীরের মাঝে থেকে চুষে নেয়।"

"কার শরীর থেকে?"

"আমার পোষা শকসো—আমার শরীর থেকে খায়।"

আমি গাঁজাখুরি গল্প শুনে হাসব না কাঁদব বুঝতে পারলাম না। মানুষটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। দুই দুই হাজার টাকা একেবারে অকারণে পানিতে ফেলে দিয়েছি বলে আফসোস হতে লাগল। একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, "এই শকসো কী করে?"

"বেশি কিছু করতে পারে না। রোগ শোক হলে বলে দিতে পারে। ওষুধপত্র দেয় মাঝে মাঝে।"

"কেমন করে দেয়?"

"বলে দেয়।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "বলে দেয়? কেমন করে বলে?"

"এই তো আপনাকে আমি যেভাবে বলি।"

"তার মানে আপনি তাকে দেখতে পারেন।"

বুড়ো তার দাড়ি নেড়ে বলল, "না দেখলে কথা বলব কেমন করে?"

আমি মুখ শক্ত করে বললাম, "আমাকে দেখাতে পারেন?"

"নাহ্।" বুড়ো মাথা নেড়ে বলল, "অন্য কেউ থাকলে বের হয় না।"

"কেন বের হয় না?"

"সবকিছুর একটা নিয়ম আছে না? মানুষের নিয়ম মানুষের শকসোর নিয়ম শকসোর।"

আমি হতাশ হয়ে বললাম, "তার মানে আমি কোনোদিন দেখতে পারব না?"

"পারবেন না কেন? আপনি দেখতে চাইলে আপনি শকসো পোষেন।"

আমি সোজা হয়ে বসে বললাম, "আমি পুষতে পারব?"

বুড়ো মানুষটা তার কোটরাগত চোখে খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "ইচ্ছা করলে মানুষ কী না পারে! তবে—"

"তবে কী?"

"শকসো পোষা কিন্তু কুত্তা-বিলাই পোষার মতো না।"

"বুঝতে পারছি।"

"বিপদ আছে।"

"বিপদ-আপদ আমার ভালোই লাগে।"

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

মানুষটা খুব শ্লেষের ভান করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তা হলে তো ভালোই।"

তারপর তার ক্যাশবাক্সের নিচে হাত ঢুকিয়ে একটা জীর্ণ কাগজ বের করে আনল। এই প্রথমবার আমি লক্ষ করলাম তার ডান হাতটা পঙ্গু—শুকনো এবং শক্তিহীন, শুধু হাতের বুড়ো আঙুলটি বড় এবং অতিকায়। শুধু তা-ই নয়, দেখে মনে হল আঙুলটি যেন তার নিয়ন্ত্রণে নেই, হঠাৎ হঠাৎ সেটি নড়ছে।

দুই হাজার টাকার বিনিময়ে আমি একটা জীর্ণ কাগজে লেখা একটি মন্ত্র এবং সেই মন্ত্রপাঠের কিছু নিয়মাবলী নিয়ে ফিরে এলাম। ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখে খানিকটা সরিষার তেল মাখিয়ে সেটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে মন্ত্র পড়তে হবে। মন্ত্র পড়ার আরও কিছু নিয়ম-কানুন আছে, গুরুপাক খাবার খাওয়া যাবে না, কাঁচা রসুন খাওয়া যাবে না, পরিষ্কার কাপড় পরে থাকতে হবে, অন্যকিছুতে মনোযোগ দেওয়া যাবে না, শুরু করতে হবে মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে ইত্যাদি ইদ্যাদি। দীর্ঘ মন্ত্র, সেটা শুরু হয়েছে এভাবে :

আচাতন, কুচাতন গিলাবালী মা
মাকাতালী রাখাতালি শুশুতালি ফা

এর পরে আরও আঠারো লাইন। এটা কী ভাষায় লেখা, এর অর্থ কী কিছুই জানি না তবুও আমি শুরু করে দিলাম। আমার স্ত্রী খুব বিরক্ত হল, কিন্তু আমি যখন শুরু করে দিয়েছি এখন তো এর শেষ না দেখে ছাড়তে পারি না। গভীর রাতে গোসল করে পরিষ্কার কাপড় পরে বারান্দায় বসে ডান হাতের বুড়ো আঙুলে সরিষার তেল মাখিয়ে বিড়বিড় করে আচাতন কুচাতন পড়তে থাকি। এইভাবে একদিন দুইদিন করে দুই সপ্তাহ পার হয়ে গেল, কিন্তু শকসোর দেখা নেই। আমি যখন মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছি যে ধড়িবাজ মানুষটা আমাকে ঠকিয়ে দুই হাজার টাকা মেরে দিয়েছে, তখন এক রাতে খুব বিচিত্র একটা ঘটনা ঘটল। নখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছি, হঠাৎ মনে হল আমার বুড়ো আঙুলটা যেন একটু নড়ে উঠল, মনে হল আঙুলটা যেন আমার নিজের না, যেন অন্য কারও। আমি অবাক হয়ে দেখলাম নখের নিচে হঠাৎ করে কেমন যেন কালচে রং দেখা যাচ্ছে, হঠাৎ করে ব্যথা পেয়ে কালশিটে পড়ে গেলে যেরকম হয় অনেকটা সেরকম। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, মনে হল বুড়ো আঙুলের ভিতরে কিছু-একটা নড়ছে, বিচিত্র একধরনের অনুভূতি। নখের মাঝে কালো রংটা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল এবং মনে হল তার পিছন থেকে জীবন্ত কিছু-

www.MurchOna.com

একটা নড়ছে। হালকা গোলাপি রঙের জিনিসটা নড়তে নড়তে স্পষ্ট হতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সেটা একটা প্রাণীর রূপ নিতে থাকে। চেহারা দেখে মনে হয় অনেকটা মানুষের মতো, কিন্তু যেন পুরোপুরি মানুষ নয়। শুধু তা-ই নয়, আমার মনে হতে লাগল প্রাণীটা যেন আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমি হঠাৎ ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম, মন্ত্র পড়া বন্ধ করে লাফিয়ে উঠে হাত ঝাঁকাতে শুরু করলাম যেন অশুভ এই প্রাণীটাকে ঝাঁকিয়ে হাত থেকে ফেলে দেওয়া যাবে। প্রায় সাথে সাথেই বুড়ো আঙুলের অসাড় হয়ে থাকা বিচিত্র অনুভূতিটা কমে গিয়ে সেটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। আমি তাকিয়ে দেখি নখটাও স্বাভাবিক হয়ে এসছে, দেখে কে বলবে একটু আগে সেখানে বিচিত্র জীবন্ত কিছু-একটা দেখা গেছে!

ব্যাপারটা কি আসলেই ঘটেছে নাকি এটা আমার মনের ভুল আমি সে-ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে পারলাম না, কিন্তু এই মাঝরাত্তিরে কেন জানি সেটা আর পরীক্ষা করে দেখার সাহস হল না। সে-রাতে আমার ঘুম হল ছাড়া-ছাড়া ভাবে, মাঝরাতে হঠাৎ ভয়ংকর একটা দুঃস্বপ্ন দেখে চিৎকার করে জেগে উঠলাম। পাশে আমার স্ত্রী শুয়েছিল, সে ভয় পেয়ে জেগে উঠে আমাকে ধরে বলল, "কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমার?"

আমি কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে কাঁপা গলায় বললাম, "খুব ভয়ের একটা স্বপ্ন দেখছিলাম—"

"কী স্বপ্ন দেখেছ?"

ভয়ের স্বপ্ন দেখতে যেরকম ভয় হয় বলতে গেলে কিন্তু সেরকম হয় না—বরং সেটাকে কেমন জানি ছেলেমানুষি এবং হাস্যকর শোনায়। আমি তাই কিছু না বলে আবার শুয়ে পড়লাম।

পরদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে অবিশ্যি আমার কাছে গতরাতের পুরো ব্যাপারটাকেই ছেলেমানুষি আর হাস্যকর মনে হতে লাগল। নখের মাঝে একটা-কিছু দেখা নিশ্চয়ই চোখের ভুল ছিল। সেখানে সর্ষের তেল মাখানোর জন্যে চকচক করছিল বলে হয়তো কোনোকিছুর প্রতিফলন পড়ছিল, মাঝরাত্তিরে উর্বর মস্তিষ্কের কল্পনায় সেটাকেই মনে হয়েছে বিদঘুটে কোনো প্রাণী—মশলার দোকানের বুড়োর ভাষায়—শকসো! ব্যাপারটা খানিকক্ষণ চিন্তা করে আমি মন থেকে দূর করে দিলাম।

পরবর্তী কয়েকদিন আমি কাজকর্ম নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম। শরীরটাও কেমন যেন ঠিক ভালো ছিল না, কড়া অ্যান্টিবায়োটিক খেলে যেমন অস্থির অস্থির লাগে সারাক্ষণই সেরকম লাগছিল। সমস্যাটা কোথায় ঠিক ধরতে পারছিলাম না, কিন্তু শুধু মনে হতে থাকে ডান হাতের বুড়ো আঙুলে কিছু-

www.MurchOna.com

একটা হয়েছে। একদিন বেশ রাত করে বাসায় ফিরে এসেছি—আমার স্ত্রী তার এক দূর সম্পর্কের বোনের বিয়েতে গেছে, বাসায় আমি একা। রাত্রিবেলা ঘুমানোর আগে আমার হঠাৎ নখের মাঝে ছবি দেখার কথা মনে পড়ল। আমি নখের দিকে তাকিয়ে অনেকটা অভ্যাসের বশেই আচাতন কুচাতন মন্ত্র পড়তে শুরু করে দিলাম এবং কী আশ্চর্য, সাথে সাথে হঠাৎ আমার বুড়ো আঙুলটা অসাড় হয়ে গেল, মনে হল ওটার ভিতরে কিছু নড়ছে এবং দেখতে দেখতে বুড়ো আঙুলের নখটা কালচে নীল রঙের হয়ে গেল। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইলাম, দেখতে পেলাম সেই কালচে নীল রঙের ভেতর থেকে একটা প্রাণীর চেহারা ভেসে আসছে, সেদিনের মতো এত অস্পষ্ট নয়, আজ এটি স্পষ্ট এবং এক কথায় ভয়াবহ।

নখের মাঝে ছোট একটি প্রাণী। কিন্তু সেটি স্পষ্ট, তার খুঁটিনাটি সব দেখা যাচ্ছে। প্রাণীটি মানুষের মতো, কিন্তু মানুষ নয়। এর উঁচু এবং আসমান কপাল, ভুরুহীন কুতকুতে চোখ, স্থির দৃষ্টি, ছোট নাক, নাকের ঠিক নিচেই বিস্তৃত একটা মুখ। আমি তাকিয়ে থাকতে থাকতেই মুখটা হাঁ করল এবং দেখতে পেলাম দাঁতহীন জিবহীন সরীসৃপের মতো লালচে পিচ্ছিল একটা মুখ। আমার সমস্ত শরীর আতঙ্কে শিউরে উঠল।

আমার ইচ্ছে করল আতঙ্কে চিৎকার করে ছুটে পালাই, কিন্তু একজন মানুষ নিজের বুড়ো আঙুল থেকে কেমন করে ছুটে পালাবে? আমি অনেক কষ্ট করে নিজেকে শান্ত করলাম, বিড়বিড় করে নিজেকে বললাম, "ভুল দেখছি। আমি নিশ্চয়ই ভুল দেখছি। আমি যদি চোখ বন্ধ করি তা হলে চোখ খুলে দেখব কিছু নেই।"

আমি খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে থেকে আবার চোখ খুললাম, ভয়ে ভয়ে আবার বুড়ো আঙুলের দিকে তাকালাম, দেখতে পেলাম কুৎসিত প্রাণীটা এখনও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি হতবুদ্ধি হয়ে প্রাণীটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, ঠিক তখন প্রাণীটা মাথা নাড়ল ডান থেকে বামে তারপর বাম থেকে ডানে। প্রথমে ধীরে ধীরে তারপর দ্রুত। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে সে যদি মাথা নেড়ে না বোঝাতে চায় অনেকটা সেরকম। প্রাণীটা হঠাৎ মাথা নাড়া বন্ধ করে মুখ হাঁ করল, আমি আবার তার দাঁতহীন জিবহীন লালচে মুখগহ্বর দেখতে পেলাম। প্রাণীটা স্থিরচোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, আমার ভুলও হতে পারে কিন্তু মনে হল সেটি যেন ক্রূর ভঙ্গিতে হাসল। তারপর হঠাৎ করে সেটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি দীর্ঘ সময় একাকী বসে রইলাম, লক্ষ করলাম আমার সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে।

www.MurchOna.com

পরদিন পুরানো ঢাকায় সেই ঘিঞ্জি গলিতে গিয়ে বুড়ো মানুষটাকে খুঁজে বের করলাম। মানুষটা আমাকে দেখে তার পান-খাওয়া দাঁত বের করে হাসার চেষ্টা করে বলল, "খবর ভালো?"

আমি ইতস্তত করে বললাম, "বুঝতে পারছি না।"

"শকসো কি এসেছে?"

"ইয়ে মানে নখের মাঝে দেখলাম—"

লোকটা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তার মানে এসেছে। সাবধানে থাকবেন এখন। উলটাপালটা কিছু হলে বিপদ হতে পারে।"

"বিপদ?"

"হ্যাঁ।" বুড়ো মানুষটা দাঁত বের করে আবার হাসার ভঙ্গি করে বলল, "শকসো আপনার শরীরে বাসা তৈরি করছে। সেখানে থাকবে এখন থেকে। আপনার রক্ত খেয়ে বড় হবে। কাজেই ভালো করে খাবেন। মাছ গোশত আর পালংশাক।"

আমি হতবাক হয়ে মানুষটার দিকে তাকিয়ে রইলাম, মানুষটা গলা নিচু করে বলল, "বেশি জানাজানি যেন না হয়। জানাজানি হলে অনেক সমস্যা।"

"কী সমস্যা?"

"লোকজন ভয় পায়। কাছে আসে না। আর লোকজনকে দোষ দেবেন কেমন করে,—ভয় পাওয়ারই তো কথা! প্রথম প্রথম আমারও ভয় লাগত।"

"এখন লাগে না?"

"না। অভ্যাস হয়ে গেছে। আপনারও অভ্যাস হয়ে যাবে। তবে শকসোরে একটু কন্ট্রোলে রাখবেন। শরীরের ভিতরে সব জায়গায় যেতে দিবেন না। আপনি টের পাবেন শরীরের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, নড়ছে, আপনি কন্ট্রোল করবেন।"

লোকটার কথা শুনে আমার সমস্ত শরীর গুলিয়ে এল। আমি হতচকিতের মতো তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। মানুষটা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "ভয় পাবার কিছু নেই। শকসো অনেক কাজে আসে। রোগশোক বালা মুসিবত বলতে পারে। তার কিছু সিগনাল আছে। যেমন ধরেন মাথা নাড়া—"

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম, "যদি ডানে-বাঁয়ে মাথা নাড়ে তার অর্থ কী?"

লোকটা চমকে আমার দিকে তাকাল, বলল, "মাথা নেড়ে না করছে?"

"অনেকটা সেরকম।"

www.MurchOna.com

"সর্বনাশ!"

"কেন? কী হয়েছে?" কথা বলতে গিয়ে আমার গলা কেঁপে গেল।

"এইটার অর্থ খুব খারাপ। এইটার অর্থ কেউ-একজন মারা যাবে।"

"কে মারা যাবে?"

"শকসোকে ডাকার আগে আপনি যাকে ছুঁয়েছেন।"

আমি মনে করার চেষ্টা করলাম সেদিন বাসায় ফেরার আগে আমি শেষবার কাকে ছুয়েছি। ক্লিনিকে আমার কোনো-একজন রোগী? কাগজ বুঝে নেবার সময় কোনো-একজন নার্স? ড্রাইভার? সিগারেটের দোকানের কমবয়সী ছেলেটা? আমি ভেবে পেলাম না।

বুড়ো মানুষটা গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বলল, "শরীরের মাঝে শকসো রাখা খুব বড় কাজ। জন্ম মৃত্যু আল্লাহ্‌র হাতে কিন্তু শকসো থাকলে সে ইঙ্গিত দেয়। বড় কঠিন ইঙ্গিত। আপনার হাতে সেই ইঙ্গিত—এটা খুব বড় দায়িত্ব। সাবধানে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে—নইলে কিন্তু গোনাগার হবেন।"

পুরানো ঢাকার ঘিঞ্জি গলিতে মশলার দোকানোর সেই বৃদ্ধের কথা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করি নি—বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে, শরীরের ভিতরে রক্ত খেয়ে ভিন্ন কোনো প্রাণী বেঁচে থাকলে তাকে কোনো-না-কোনোভাবে ধরা সম্ভব, টেস্টটিউবে ভরে সেটাকে টিপেটুপে দেখা সম্ভব। নখের নিচে এসে কেউ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে পারবে না। আমি নিজের চোখে দেখলেও সেটা বিশ্বাস করব না।

বাসায় এসেই অবিশ্যি আমার সেটা বিশ্বাস করতে হল। আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে—এইমাত্র তার খবর এসেছে। একটা এন.জি.ও.-তে চাকরি করত, ময়মনসিংহ যাচ্ছিল, উলটো দিক থেকে একটা ট্রাক এসে ধাক্কা দিয়েছে। গাড়িতে চারজন ছিল—তিনজন সাথে সাথে মারা গেছে, চতুর্থজন হাসপাতালে এখনও সংজ্ঞাহীন। আমার বন্ধু তিনজনের একজন। আমার এখন মনে পড়েছে রাত্রিবেলা তার সাথে কথা বলে যাবার আগে পিঠে একটা থাবা দিয়ে এসেছিলাম—আমার হাতে তাকেই আমি শেষবার স্পর্শ করে এসেছিলাম। শকসো ঠিক ইঙ্গিতই দিয়েছে।

ঘটনাটি আমাকে সাংঘাতিকভাবে নাড়া দিল, শরীরের মাঝে বিদঘুটে একটা প্রাণী বাস করছে, মানুষের জীবন নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করছে, সেটা নিয়ে আমার খুব-একটা মাথাব্যথা হল না—কিন্তু হাট্টা কাট্টা প্রাণবন্ত একজন মানুষ যে একেবারে হঠাৎ করে মারা যেতে পারে সেটা আমার জন্যে গ্রহণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ল।

www.MurchOna.com

যাই হোক, তারপর অনেকদিন কেটে গেছে, বুড়ো আঙুলে সেই অশরীরী প্রাণীর কথা আমি একরকম ভুলে গেছি, তখন একদিন ক্লিনিকে একটা রোগী এসেছে। কমবয়সী বাচ্চা, হৃৎপিণ্ডের ভাল্ব নিয়ে একটা সমস্যা হয়েছে, অত্যন্ত জটিল অপারেশান, আমাদের দেশে তখনও কেউ সেটা সাহস করে করছে না। অপারেশান করার আগের রাতে আমি তাকে দেখতে গিয়েছি, বিছনায় ম্লান মুখে শুয়ে আছে। আমি তার হাত স্পর্শ করলাম, হঠাৎ কী মনে হল বিড়বিড় করে সেই মন্ত্র পড়তে শুরু করলাম, আচাতন কুচাতন গিলাবালী মা ...

প্রায় সাথে সাথেই বুড়ো আঙুলে কুৎসিত সেই মাথাটা ফুটে উঠল। মাথাটি আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে কয়েকবার উপরে-নিচে করল, কোনোকিছুতে সম্মতি জানাতে হলে আমরা যেভাবে মাথা নাড়ি। তারপর হঠাৎ করে সেটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমি ডাক্তার-মানুষ, আমার কুসংস্কার থাকা ঠিক নয়, কিন্তু তখন আমি কীভাবে জানি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, যত কঠিনই হোক এই অপারেশান দিয়ে ছেলেটার প্রাণ বেঁচে যাবে।

পরদিন ছেলেটার সার্জারি হল—দীর্ঘ সার্জারি—প্রায় ছয় ঘণ্টার মতো লাগল। অপারেশান থিয়েটার থেকে যখন বের হলাম আমরা এত ক্লান্ত যে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, কিন্তু সবাই খুব খুশি। চমৎকারভাবে সার্জারি শেষ হয়েছে, ছেলেটা বেঁচে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

সত্যিই ছেলেটা বেঁচে গেল। সপ্তাহ দুয়েক পর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে গেল। ঘটনাটায় আমার হয়তো খুশি হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি কেন জানি খুশি হতে পারলাম না। নিজেকে কেমন জানি একটা প্রতারক প্রতারক মনে হতে লাগল। যদি দেখতে পেতাম শকসোটা মাথা নেড়ে বলছে ছেলেটা বাঁচবে না, তা হলে কি আমি তার জন্যে এত শক্তি ব্যয় করতাম, নাকি দায়সারাভাবে কিছু-একটা করতাম?

ব্যাপারটা পরীক্ষা করার সুযোগ এসে গেল দুদিন পরেই। একজন রোগী অপারেশনের জন্যে অপেক্ষা করছে। জটিল অপারেশান, কিন্তু আমি আগে অনেক করেছি। সত্যি কথা বলতে কী, ঢাকা শহরে এই বিশেষ অপারেশনটির জন্যে আমার খানিকটা খ্যাতি আছে। ক্যাবিনে যখন কেউ নেই আমি রোগীটার হাত ধরে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তেই শরীরের ভিতরে একটা কম্পন অনুভব করলাম, মনে হল সত্যি সত্যি কিছু-একটা শরীরের ভিতরে নড়ছে, হাত বেয়ে সেটা আমার নখের তলায় হাজির হল। কুৎসিত প্রাণীটা আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ডান থেকে বামে মাথা নাড়ল। শকসোটা মনে করে রোগীটা বাঁচবে না।

www.MurchOna.com

আমার কেন জানি রোখ চেপে গেল, মনেমনে ঠিক করলাম যেভাবেই হোক একে বাঁচাতেই হবে। আমি রোগীর যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যতটুকু সম্ভব প্রস্তুত হয়ে অপারেশান থিয়েটারে নিয়ে গেলাম। দীর্ঘদিন থেকে সার্জারি করছি, হাতে চাকু ধরামাত্রই নিজের ভিতরে কেমন জানি একটা আত্মবিশ্বাস অনুভব করি, আজকেও তার ব্যতিক্রম হল না। জুনিয়র ডাক্তাররা মোটামুটি প্রস্তুত করে সরে গেছে, আমি কাজ শুরু করেছি, হঠাৎ একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটল, আমার মনে হল আমার বুড়ো আঙুলটা যেন জীবন্ত হয়ে গেছে—তার উপর যেন আমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ফোরসেপ দিয়ে ধরে যেই চাকু নামাতে যাই চাকুটা নড়ে যায়—কিছুতেই ঠিক জায়গায় বসাতে পারি না। জোর করে চেষ্টা করতেই হঠাৎ করে একটা বড় আর্টারি কেটে ফেললাম—গলগল করে রক্ত বের হয়ে এল। বলা যেতে পারে আমার জীবনে এর থেকে বড় দুঃসময় আর কখনো আসে নি।

আমি নিজে অপারেশন চালিয়ে যেতে পারলাম না, জুনিয়র ডাক্তাররা জোড়াতালি দিয়ে কোনোভাবে শেষ করল। আমি পুরোপুরি পরাজিত একজন মানুষের মতো ফিরে এলাম। রোগীটি যে ভোর হবার আগেই মারা যাবে সে-ব্যাপারে আমার নিজের কোনো সন্দেহ ছিল না।

বাসায় এসে আমি অন্ধকার বারান্দায় মুখ ঢেকে বসে আছি, তখন আমার স্ত্রী এসে আমার কাছে বসল। নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে?"

আমি তখন খুব দুর্বল হয়ে আছি, পুরো ব্যাপারটা আমার উপরে এত ভয়ংকর চাপ সৃষ্টি করেছে যে সেটা আর নিজে নিজে সহ্য করতে পারছি না। আমি ঠিক করলাম আমার স্ত্রীকে সব খুলে বলতে হবে, কারও সাথে এই ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের যন্ত্রণাটা ভাগাভাগি করে নিতে হবে।

আমি আমার স্ত্রীকে বললাম, "আমি তোমাকে আজ একটা কথা বলব। আমি ব্যাপারটা তোমার কাছ থেকে অনেকদিন গোপন রেখেছি।"

আমার কথা শুনে আমার স্ত্রী খুব অবাক হল না, নিচু গলায় বলল, "আমিও তোমাকে একটা কথা বলব যেটা আমি তোমার কাছ থেকে গোপন রেখেছি।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "কী কথা?"

"আগে তোমারটা বলো।"

আমি কিছু-একটা বলতে চাইছিলাম, কিন্তু আমার স্ত্রী শান্ত চোখে বলল, "তুমি, আগে বলো। প্লীজ!"

আমি তখন একটা বড় নিশ্বাস নিয়ে তাকে আমার গত কয়েকদিনের কথা বলতে শুরু করলাম। কেমন করে ব্যাপারটা শুরু হল, কেমন করে

www.MurchOna.com

সত্যি সত্যি বুড়ো আঙুলের নিচে কদর্য একটা মুখ ভেসে আসতে শুরু করল, কেমন করে সেটা মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করতে শুরু করল, কেমন করে আমাকে অপারেশান টেবিলে পুরোপুরি অকর্মণ্য করে তুলল, আমি কিছুই গোপন করলাম না।

সবকিছু শুনে আমার স্ত্রী হতবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বলল, "তুমি এটা বিশ্বাস কর?"

আমি মাথা নেড়ে বললাম, "আমি বিশ্বাস করতে চাই না, কিন্তু তুমিই বলো আমি কেমন করে অবিশ্বাস করি?"

আমার স্ত্রী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "ভালোই হল।"

"কী ভালোই হল?"

"তুমি বলে দিতে পারবে আমি বাঁচব কি বাঁচব না।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "কী বলছ তুমি?"

"আমি খুব অসুস্থ।"

"কী হয়েছে তোমার?"

"লিউকিমিয়া।"

আমি চমকে উঠে বললাম, "কী বলছ তুমি!"

"হ্যাঁ। আমি অনেকদিন থেকে পরীক্ষা করাচ্ছি। ব্লাড স্যাম্পল সিংগাপুর থেকে পরীক্ষা করিয়ে আনা হয়েছে। পজিটিভ।"

"আমাকে—আমাকে—তুমি এতদিন বলনি কেন?"

আমার স্ত্রী হাসার চেষ্টা করে বলল, "এই তো বললাম। আগে থেকে বললে তুমি আগে থেকে দুশ্চিন্তা করতে।"

"কিন্তু, কিন্তু—"

"কিন্তু কী?"

আমি কিছু না বলে হতবাক হয়ে আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার স্ত্রী আমার গায়ে হাত বুলিয়ে নরম গলায় বলল, "তুমি জান এই লিউকিমিয়ার চিকিৎসা কী। কিমো থেরাপি। বড় কষ্ট এই চিকিৎসায় আমি জানি। যদি আমি বাঁচব না তা হলে এই কষ্টের ভিতর দিয়ে আমি যেতে চাই না। জীবনের শেষ কয়টা দিন আমি একটু শান্তিতে কাটাতে চাই।"

আমি বিস্ফারিত চোখে আমার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। সোজা হয়ে বসে বললাম, "কী বলছ তুমি এসব?"

"ঠিকই বলছি।" আমার স্ত্রী তার হাতটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "নাও। আমাকে ধরো। ধরে তুমি তোমার আচাতন কুচাতন মন্ত্রটা বলো।"

"না।"

"তোমাকে বলতে হবে।"

"না, কিছুতেই না।" আমি চিৎকার করে বললাম, "কিছুতেই না। আমি এসব বিশ্বাস করি না।"

"আমি করি।" আমার স্ত্রী আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, "অবুঝ হয়ো না। প্লীজ। বলো, আমি বাঁচব কি বাঁচব না।"

গল্পের ঠিক এই পর্যায়ে এয়ারপোর্টের পেজিং সিস্টেমে ঘোষণা দেওয়া হল সিলেটগামী প্যাসেঞ্জাররা যেন ডিপারচার লাউঞ্জে এসে হাজির হয়। প্লেনটা এক্ষুনি ছাড়বে। ডাক্তার মাহবুব খন্দকার গল্প থামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমিও ব্যাগ নিয়ে উঠে দাড়ালাম, জিজ্ঞেস করলাম, "তারপর?"

"তারপর দেখতেই পাচ্ছেন। ওয়াইফকে একটু বুঝিয়ে বাথরুমে গেলাম। হ্যাক স ছিল, ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে বুড়ো আঙুলটা কেটে ফেললাম।"

আমি শিউরে উঠে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোক ব্যাগটা হাতে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। আমি পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, "আপনার স্ত্রী?"

"সে ভালো আছে। পারফেক্ট। ফিট অ্যাজ এ ফিডল। লিউকিমিয়ার চমৎকার চিকিৎসা বের হয়েছে।" ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে সহৃদয় ভঙ্গিতে হাসলেন।

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলাম, "আমার একটা প্রশ্ন রয়ে গেছে।"

"বলুন।"

"যখন আপনি বুড়ো আঙুলটা কাটলেন তখন শকসোটা কোথায় ছিল? কী হল সেটার।"

ডাক্তার মাহবুব আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, "সেটা আরেক কাহিনী। বিমানমন্ত্রীর আরেক শালীর বিয়ে না হলে সেটা বলে শেষ করা যাবে না।"

www.MurchOna.com

ফ্রাণী

"ফ্রাণী কাহাকে বলে?" জলীল স্যার ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়বার প্রশ্নটা উচ্চারণ করে ক্লাসের দিকে তাকালেন।

টিটু মনেমনে বলল, "উচ্চারণটা হচ্ছে প্রাণী। ফ্রাণী না।" কিন্তু মুখে কোনো শব্দ করল না। জলীল স্যারকে উচ্চারণ শেখালে বিপদ আছে।

স্যার এক পা এগিয়ে এসে বললেন, "বল ফ্রাণী কাহাকে বলে?"

এবারে আজমল হাত তুলল এবং সাথে সাথে জলীর স্যারের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হল। আজমল হচ্ছে ক্লাসের অন্যতম ভালো ছেলে। তার চুল ছোট করে ছাঁটা থাকে, তেল দিয়ে পরিপাটি করে সেই ছোট ছোট চুল ভিজিয়ে আঁচড়ানো থাকে। তার শার্ট নিখুঁতভাবে প্যান্টের মাঝে গুঁজে দেওয়া থাকে, সব বই এবং খাতায় মলাট লাগানো থাকে। সে ছোটাছুটি করে না, মারপিট করে না, ক্লাসে যেটা পড়ানো হবে সেটা তার আগে থেকে পড়া থাকে। স্যার কিংবা আপারা জিজ্ঞেস করলে সে সবার আগে হাত তুলে তার উত্তর দেয়।

জলীল স্যার আজমলের দিকে তাকিয়ে গলায় মধু ঢেলে বললেন, "বল আজমল।"

আজমল দাঁড়িয়ে মুখস্থ বলার মতো বলল, "পৃথিবীর সকল কিছুকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—জড়বস্তু এবং প্রাণী। পাথর ও বৃষ্টি জড়বস্তু। বিড়াল ও বটবৃক্ষ প্রাণী। জড়বস্তু নড়াচড়া করিতে পারে না এবং তাহাদের সংবেদনশীল স্নায়ু নাই। কিন্তু প্রাণী নড়াচড়া করিতে পারে, তাহাদের . . . ."

টিটু তাদের জীববিজ্ঞান বই খুলে দেখল, আজমল একেবারে পুরো চ্যাপ্টার মুখস্থ করে এসেছে, দাঁড়ি-কমাসহ! পাঠ্যবইয়ের ভাষা কিছু বোঝা

www.MurchOna.com

যায় না, তার উপর আজমল যেভাবে রেলগাড়ির মতন গড়গড় করে মুখস্থ বলে যাচ্ছে, কী বলছে তার কিছুই বোঝা গেল না, শুধু মুখস্থটা যে খুব ভালো হয়েছে সেটা বোঝা গেল। জলীল স্যার শুনে খুব খুশি হলেন, দাঁত বের করে হেসে বললেন, "বেরি গুড।"

টিটু দাঁতের ফাঁক দিয়ে নিশ্বাস নিয়ে মনেমনে বলল, "বেরি গুড না—ভেরি গুড।"

জলীল স্যার এবারে আজমলকে ছেড়ে বাকি ক্লাসের দিকে নজর দিলেন এবং প্রায় সাথে সাথেই তাঁর মুখ থেকে হাসি সরে গিয়ে সেটা শক্ত হয়ে গেল, দেখে মনে হতে লাগল স্যার বুঝি একক্লাস গোরু-ছাগলের দিকে তাকিয়ে আছেন। নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "বুঝেছিস ফ্রাণী কাহাকে বলে?"

ক্লাসের সবাই মাথা নাড়ল। প্রাণী হচ্ছে বইয়ের চোদ্দ পৃষ্ঠায় লেখা কিছু কথা, বাসায় গিয়ে সেটা মুখস্থ করে ফেলতে হবে, এর মাঝে না বোঝার কী আছে? জলীল স্যারকে দেখে অবশ্য মনে হল তাঁর বুঝি পড়ানোর মুড এসেছে। মুখটা ছুঁচালো করে বললেন, "যারা বুঝিস নাই তারা মন দিয়ে শোন। ফ্রাণী কী? জড় ফদার্থ এবং ফ্রাণীর মধ্যে ফার্থক্য কী?"

টিটু নিশ্বাস আটকে দাঁতের মাঝে দাঁত চেপে মনেমনে বলল, "ফদার্থ না, পদার্থ। ফার্থক্য না, পার্থক্য।"

জলীল স্যার বলতে লাগলেন, "ফ্রাণীর ফ্রথম বৈশিষ্ট্য তাদের খেতে হয়। তাদের নিশ্বাস নিতে হয়। তারা বর্জ্য ফদার্থ ত্যাগ করে। তাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য তারা লড়াচড়া করতে পারে। জড় ফদার্থ লড়াচড়া করে না, শুধু জীবন্ত ফ্রাণী লড়াচড়া করে।"

টিটু এবারে হাত তুলল, বলল, "স্যার।"

সাথে সাথে জলীল স্যারের মুখ শক্ত হয়ে গেল, ক্লাসে খালি প্রশ্ন করে বলে টিটুকে জলীল স্যার দুই চোখে দেখতে পারেন না। মুখ শক্ত করেই বললেন, "কী?"

"স্যার, মোটরগাড়ি চালাতে পেট্রল লাগে, ইঞ্জিনে অক্সিজেন লাগে। বর্জ্য হিসেবে কালো ধোঁয়া বের হয়। তা হলে কি মোটরগাড়ি একটা প্রাণী?"

কথাটা টিটু মোটেই ঠাট্টা করে বলে নি, একটা যুক্তি দিয়ে বলেছে, কিন্তু ক্লাসের সবাই হাহা করে হেসে উঠল। জলীল স্যার সেটাকে একটা ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে ধরে নিলেন। স্যারের কালো মুখ আরও কালো এবং থমথমে হয়ে উঠল। স্যার ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে এগিয়ে

এসে খপ করে টিটুর কান ধরে তাকে বেঞ্চ থেকে টেনে তুলে ফেললেন, মুখ ছুঁচালো করে বললেন, "মাথায় এইটুকু বুদ্ধি? গাড়ি একটা ফ্রাণী?"

"না স্যার, কিন্তু প্রাণীরা যা যা করতে পারে গাড়িও তো তা-ই করতে পারে।"

জলীল স্যার টিটুর কান ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "ফ্রাণীদের আরও বৈশিষ্ট্য আছে গাধা কোথাকার! ফ্রাণীরা বড় হয় আর বাচ্চা ফয়দা করে।"

টিটু মনেমনে বলল, "ফয়দা না, পয়দা।" বাচ্চা পয়দা করা আর বড় হওয়া নিয়েও তার কিছু বক্তব্য ছিল, কিন্তু জলীল স্যার যখন শক্ত হাতে কান ধরে রেখেছেন তখন সেটা নিয়ে কথা বলা বিপজ্জনক হতে পারে। কাজেই টিটু কানের যন্ত্রণাটা সহ্য করে চুপ করে রইল। স্যার আবার কানে ধরে একটা হ্যাঁচকা ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "গাড়ি কি কখনো বড় হয়? দেখেছিস কখনো একটা টেম্পো বড় হয়ে ট্রাক হয়েছে? দেখেছিস?"

টিটু মাথা নেড়ে বলল যে সে দেখে নি।

"কখনো দেখেছিস একটা বাস একটা বেবিট্যাক্সি বাচ্চা দিয়েছে? দেখেছিস?"

টিটুকে স্বীকার করতেই হল যে সেটাও সে দেখে নি। জলীল স্যার এবারে যুদ্ধজয় করার ভঙ্গি করে আস্তে আস্তে ক্লাসের সামনের দিকে চলে গেলেন। টিটু যখন দেখল তার থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে এবং আচমকা তাকে মেরে বসতে পারবেন না তখন আবার সাহস করে বলল, "স্যার!"

"আবার কী হল?"

"যদি কখনো দেখা যায় কোনোকিছু নড়তেচড়তে পারে, সেটাকে খাবার থেকে শক্তি নিতে হয়, বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করে, বড় হতে পারে, আবার নিজের মতো হুবহু আরেকটা জিনিস তৈরি করতে পারে তা হলে কি সেটাকে প্রাণী বলা যাবে?"

জলীল স্যার চোখ ছোট ছোট করে টিটুর দিকে তাকিয়ে থেকে আন্দাজ করার চেষ্টা করলেন তার মতলবটা কী, কোনো-একটা যুক্তি দিয়ে আবার তাকে বিপদে ফেলে দেবে কি না। যখন মনে হল এই মুহূর্তে সেরকম কিছু করতে পারবে না, তখন একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "হ্যাঁ, বলা যাবে সেটা ফ্রাণী।"

টিটু সাথে সাথে বসে পড়ল দেখে জলীল স্যার নিশ্চিন্ত হলেন এবং গলা উঁচিয়ে বললেন, "ফড়াশোনার উদ্দেশ্য হল ভালো নম্বর পাওয়া। বইয়ে যা

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

আছে মুখস্থ করে হুবহু লিখবি, সেটা নিয়ে কখনো তর্ক করবি না। যারা বই লিখেছে তারা কি না জেনেশুনে বই লেখে?"

টিটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনেমনে বলল, "ফড়াশোনার উদ্দেশ্য নম্বর ফাওয়া না—পড়াশোনার উদ্দেশ্য শেখা।" কিন্তু সেটা সে জোর গলায় বলতে পারল না, এই স্কুলে কেউ এই কথা জোর দিয়ে বলতে পারে না।

পরের দিন বিজ্ঞান ক্লাসে জলীল স্যার এলেন না, দপ্তরি দিয়ে একটা নোটিশ পাঠালেন। নোটিশে লেখা জরুরি কাজে তিনি ক্লাসে আসতে পারছেন না, সবাই যেন বিজ্ঞান বইয়ের উনত্রিশ পৃষ্ঠা থেকে সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠা মুখস্থ করে ফেলে। আজমলের উপর নির্দেশ থাকল ক্লাসের উপর নজর রাখা, কেউ যদি গোলমাল করে তা হলে তার নাম লিখে রাখা, স্যার পরের ক্লাসে তাদের এমন ধোলাই দেবেন যে তারা তাদের বাবার নাম না হলেও মামা-চাচাদের নাম ভুলে যাবে। সবাই যখন উনত্রিশ থেকে সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠা মুখস্থ করতে লাগল তখন আজমল একটা কাগজ আর কলম নিয়ে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে রইল, কেউ একটু মুখ খুললেই তার নাম উঠে যাবে। আজমল এমনিতেই স্যারদের কথা অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলে, এসব ব্যাপারে শুধু অক্ষরে-অক্ষরে নয়, দাঁড়ি-কমাসহ মেনে চলে—কাজেই কেউ টুঁ শব্দ করার সাহস পেল না।

জলীল স্যার কেন ক্লাসে এলেন না বোঝা গেল না, কিন্তু দেখা গেল স্কুলের বাইরে একটা পিকআপ ট্রাক এসে থেমেছে, তার ভেতর থেকে কার্ডবোর্ডের বড় বড় বাক্স নামানো হচ্ছে। জলীল স্যারকে দেখা গেল খুব ব্যস্ততার ভান করে হাঁটাহাঁটি করছেন। বাক্সগুলি যখন ধরাধরি করে নেওয়া হচ্ছে তখন তার পাশে দাঁড়িয়ে জলীল স্যার এমন ভাব করতে লাগলেন যেন বাক্সগুলির ভিতরে ছোট ছোট অ্যাটমবোমা রয়েছে, একটু ধাক্কা লাগলেই সেগুলি ফেটে যাবে।

পরদিন বাক্সগুলির রহস্যভেদ হল। জলীল স্যার ক্লাসে এসে এমন ভাব করতে লাগলেন যে মনে হল তাঁকে বুঝি ভোট দিয়ে দেশের প্রেসিডেন্ট করে দিয়েছে—এক্ষুনি তাঁকে বঙ্গভবনে চলে যেতে হবে। মুখটা ছুঁচালো করে ক্লাসের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "বিজ্ঞান শিক্ষা কখনই ফূর্ণাঙ্গ হয় না যদি সেটা হাতে-কলমে করা না যায়। (টিটু দাঁতে দাঁত ঘষে মনেমনে বলল, ফূর্ণাঙ্গ না, পূর্ণাঙ্গ!) এই আধুনিক যুগে কম্পিউটারের শিক্ষা না দেওয়া হলে সেই শিক্ষা হবে অফর্যাপ্ত (আবার দাঁতে

www.MurchOna.com

দাঁত ঘর্ষণ : অফর্যাপ্ত না—অপর্যাপ্ত!) কাজেই আমাদের স্কুলে বিজ্ঞানশিক্ষার জন্যে একটা এন. জি. ও. একটা কম্পিউটার দিয়েছে। কাজেই এখন থেকে তোমাদের কম্পিউটারে শিক্ষা দেওয়া হবে।"

ক্লাসের সব ছেলে আনন্দের মতো শব্দ করল এবং জলীল স্যার পর্যন্ত এই চ্যাঁচামেচি মাফ করে দিলেন।

আজমল হাত তুলে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, আপনি কি আমাদের কম্পিউটার শেখাবেন?"

স্যার ঠোঁট উলটিয়ে এমন ভাব করলেন যেন এই প্রশ্ন করে কেউ তাঁকে অপমান করে ফেলেছে। মুখটা বাঁকা করে বললেন, "আর কে আছে স্কুলে?"

স্কুলে আরও স্যারেরা আছেন, আপারা আছেন, তাঁদের অনেকে সত্যিকারের ভালো মানুষ, শুদ্ধ বাংলাতেও কথা বলতে পারেন, কিন্তু কেউ আর সেটা স্যারকে মনে করিয়ে দিতে সাহস পেল না। টিটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কম্পিউটার চালাতে পারেন, স্যার?"

জলীল স্যারের মুখ তখন একটু কালো হয়ে গেল। স্যারের গায়ের রং এমনিতেই কালো, তাই যখন তাঁর মুখ কালো হয়ে যায় সেটা সহজে বোঝা যায় না, কিন্তু তখন তাঁর চোখ ছোট ছোট হয়ে যায়, নাক ফুলে যায়, ঠোঁট সরু হয়ে যায় এবং সেইসব দেখে আন্দাজ করতে হয়। স্যার ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "সেইটা কি তোর মাথাব্যথা নাকি স্কুল কমিটির মাথাব্যথা? এই স্কুলে কে কম্পিউটার চালাতে ফারে সেইটা স্কুল কমিটি জানে না?"

রাগের মুখে স্যার আরও গালাগালি করতেন, কিন্তু আজমল অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে ফেলল। স্যারদের তোষামোদ করায় সে একেবারে এক নম্বর, সবগুলি দাঁত বের করে বিগলিত হয়ে বলল, "আপনাকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্যে নিশ্চয়ই বিদেশে পাঠাবে। পাঠাবে না স্যার?"

জলীল স্যার মুখে একটা উদাস-উদাস ভাব করে বললেন, "ফাটানোই তো উচিত। এত বড় একটা ব্যাপার—দেশে কি ট্রেনিং দেওয়ার মতো কেউ আছে?"

টিটু মনেমনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কম্পিউটার চালানোকে জলীল স্যার প্লেন চালানোর মতো বড় একটা ব্যাপার মনে করছেন। টিটুর ছোট চাচা ঢাকা থাকেন, তাঁর দুই ছেলেমেয়ে বয়সে টিটুর থেকে ছোট, তারা ছোট চাচার কম্পিউটার ব্যবহার করে চিঠি লেখে, জন্মদিনের কার্ড তৈরি করে পাঠায়। কম্পিউটার চালানো যদি সত্যি কঠিন হত তা হলে এত ছোট ছোট বাচ্চারা সেটা কেমন করে করত? কম্পিউটার শেখার জন্যে যদি সত্যি

www.MurchOna.com

সত্যি মানুষকে বিদেশ যেতে হয় তা হলে কে জানে দাঁত ব্রাশ করার জন্যেও বিদেশ যেতে হবে, বাথরুম করার জন্যেও বিদেশ যেতে হবে। বাথরুম করার জন্যে সবাই হুড়োহুড়ি করে প্লেনে উঠে বিদেশ যাচ্ছে দৃশ্যটা চিন্তা করে টিটুর হাসি পেয়ে গেল এবং মনে হয় সে একটু হেসেও ফেলল, কারণ হঠাৎ করে সে শুনতে পেল জলীল স্যার বাজখাঁই গলায় ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, "কী হল? হাসছিস কেন তুই গাধা কোথাকার?"

টিটু দুর্বল গলায় বলল, "না স্যার, হাসছি না।"

"খবরদার মিছা কথা বলবি না। স্ফষ্ট দেখলাম তুই হাসছিস। ফড়াশোনায় মন নাই ক্লাসে হাসাহাসি! ফ্রাণী কাহাকে বলে মুখস্থ করেছিস?"

টিটু একেবারে বিপদে না পড়লে কিছু মুখস্থ করে না—জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করে, কিন্তু এখন সেটা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে না, তাই সে মাথা নাড়ল।

"তোর কি এখনও মনে হয় গাড়ি একটা ফ্রাণী?"

"না স্যার।"

"আর গাধা? গাধা কি একটা ফ্রাণী?

জলীল স্যার কী বলবেন কে জানে, টিটু কোনো ঝুঁকি নিল না, মাথা নেড়ে বলল গাধা একটি প্রাণী

"ছাগল?"

"ছাগলও প্রাণী।"

"তুই নিজে?"

টিটু দুর্বল গলায় বলল, "আমিও প্রাণী।"

জলীল স্যার এবার বক্তৃতা দেওয়ার মতো করে বললেন, "গাড়ি ফ্রাণী নয়, চক-ডাস্টার ফ্রাণী নয়, চেয়ার-টেবিলও ফ্রাণী নয়। কিন্তু গাধা একটি ফ্রাণী, ছাগল একটি ফ্রাণী এবং আমাদের টিটুও একটা ফ্রাণী।"

কথা শেষ করে স্যার ভান করলেন তিনি খুব উঁচুদরের একটা রসিকতা করেছেন এবং জোরে জোরে হাহা করে হাসতে লাগলেন। স্যারের দেখাদেখি তখন অন্যেরাও জোরে জোরে হাসতে লাগল। টিটুর তখন এত মেজাজ খারাপ হল যে সেটি আর বলার মতো নয়।

কম্পিউটারের ট্রেনিং দেওয়ার জন্যে জলীল স্যারকে অবিশ্যি বিদেশে পাঠানো হল না। কাছাকাছি এক এন. জি. ও. অফিস থেকে চালবাজ ধরনের একজন

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

মানুষকে স্কুলে পাঠানো হল। স্কুলের ল্যাবরেটরি-ঘরে কম্পিউটারটি বসানো হয়েছে, সেখানে মানুষটি স্যারকে কম্পিউটারের উপর ট্রেনিং দিতে শুরু করেছে। জলীল স্যারকে কয়েকদিনের মাঝেই কেমন যেন বিধ্বস্ত দেখাতে লাগল, কম্পিউটারের সামনে শুকনো মুখে বসে থাকেন এবং ট্রেনিং দেওয়ার নাম করে চালবাজ লোকটা তাঁকে গালাগাল করে। ল্যাবরেটরি-ঘরের কাছাকাছি গিয়ে একদিন টিটু স্পষ্ট শুনতে পেল চালবাজ লোকটা বলছে, "কী ব্যাপার? এই সোজা জিনিসটা বোঝেন না? আপনার মাথায় কি গোবর ঠাসা আছে?"

এরকম সময়ে ঢাকা থেকে ছোট চাচা অফিসের কাজে টিটুদের বাসায় বেড়াতে এলেন। এমনিতে ছোট চাচা খুব ব্যস্ত মানুষ, সারাদিন দৌড়াদৌড়ি করে সন্ধেবেলা বাসায় ফিরে আসেন, কিন্তু বাসায় ফিরে এসেও প্রায় সারারাত হৈচৈ করে গল্পগুজব করেন। প্রথম দিনেই টিটু ছোট চাচাকে জিজ্ঞেস করল, "ছোট চাচা, কম্পিউটার চালানো শেখা কি খুব কঠিন?"

"কম্পিউটার কি সাইকেল নাকি যে চালানো শিখবে? কম্পিউটার হচ্ছে একটা টুল, এটা ব্যবহার করবে।"

টিটু একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "ঠিক আছে, তা হলে বলো কম্পিউটার ব্যবহার করা কি কঠিন?"

ছোট চাচা হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো একটা ভঙ্গি করে বললেন, "ধুর! টুকটাক কাজের জন্যে কম্পিউটার ব্যবহার করা কান চুলকানোর মতো সোজা। বিলু আর সানি করছে না?"

বিলু আর সানি ছোট চাচার ছেলেমেয়ের নাম। টিটু মাথা নেড়ে বলল, "কম্পিউটার ব্যবহার করা শিখতে কয়দিন লাগে ছোট চাচা?"

ছোট চাচা চোখ ছোট ছোট করে বললেন, "শিখবি?"

"কেমন করে শিখব? কম্পিউটার পাব কোথায়?"

ছোট চাচা রহস্যের মতো ভঙ্গি করে তাঁর অ্যাটাচি কেস খুলে বড় একটা বইয়ের মতো কী-একটা বের করে সেটাকে খুলে ফেললেন, টিটু অবাক হয়ে দেখল একটা আস্ত কম্পিউটার! ছোট চাচা সুইচ টিপে সেটা অন করে দিয়ে বললেন, "এটার নাম ল্যাপ টপ—কোলের উপরে থাকে তো! অফিসের কাজকর্ম করার জন্যে সাথে রাখতে হয়।"

"এটার কত দাম ছোট চাচা?"

"দামের কথা জিজ্ঞেস করবি না—শুনলে হার্টফেল হয়ে যাবে। এই দ্যাখ—"

www.MurchOna.com

ছোট চাচা দাম শুনলে হার্টফেল হয়ে যাবে অথচ দেখে মনে হয় একটা খেলনা সেই কম্পিউটার দিয়ে টিটুকে শেখানো শুরু করলেন। আম্মা এসে দেখে বললেন, "কী করছ? ভুল জিনিস টেপাটেপি করে নষ্ট করে ফেলবে।"

ছোট চাচা মাথা নেড়ে বললেন, "ভুল জিনিস টেপাটেপি করে কেউ কম্পিউটার নষ্ট করতে পারে না।"

"তাই বলে এত দামি জিনিস বাচ্চাকে খেলতে দিচ্ছ?"

ছোট চাচা হেসে বললেন, "আমি খেলতে দিচ্ছি না ভাবি। টিটুকে শেখাচ্ছি।"

আম্মা চোখ কপালে তুলে বললেন, "এই অল্প বয়সে কী শিখবে? বড় হোক।"

"বড় হলে তো শিখবেই। এখনই শুরু করুক। কম্পিউটার এমন একটা জিনিস যেটা বড়দের থেকে ছোটরা ভালো বোঝে।"

ছোট চাচার কথা যে সত্যি সেটার প্রমাণ পাওয়া গেল। ছোট চাচা পাঁচদিন ছিলেন, তার মাঝেই টিটু মোটামুটিভাবে কম্পিউটার ব্যবহার করা শিখে গেল। কীভাবে কী করতে হয় সেটা একবার ধরে নেওয়ার পর দেখা গেল পুরো ব্যাপারটাই আসলে খুব সহজ। ছোট চাচা চলে যাবার আগে কিছু-কিছু ছোটখাটো মজার প্রোগ্রাম টিটুকে কপি করে দিচ্ছিলেন—তাদের স্কুলের কম্পিউটারে সুযোগ পেলে চালিয়ে দেখতে পারবে।

বসে বসে প্রোগ্রামগুলি কপি করার সময় টিটু একটা ফ্লপি ডিস্ক কম্পিউটারে ঢোকাচ্ছে, হঠাৎ ছোট চাচা হাহা করে চিৎকার করে উঠলেন, "ওটা ঢুকাস না। সর্বনাশ!"

টিটু একটু থতমত খেয়ে গেল, "কেন ছোট চাচা?"

"এই ডিস্কটাতে খুব খারাপ একটা ভাইরাস আছে। এখানে ভুলে চলে এসেছে। সরিয়ে রাখ।"

টিটু ডিস্কটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে বলল, "ভাইরাস?"

"হ্যাঁ। ফাজিল প্রোগ্রামাররা একধরনের প্রোগ্রাম তৈরি করে, সেগুলি এমনিতে দেখা যয় না—গোপনে কম্পিউটারের মেমোরিতে হাজির হয়, তারপর সর্বনাশ করে ফেলে।"

"তার মানে—তার মানে—" টিটু তোতলাতে তোতলাতে বলল, "সত্যিকার জীবাণুর মতো?"

"সত্যিকার জীবাণু থেকেও খারাপ! এই ডিস্কেটে যে-ভাইরাসটা আছে সেটা নাকি তৈরি হয়েছে ইস্ট ইউরোপে—তৈরি করেছে আঠারো-উনিশ বছরের কয়টা ছেলে। ভাইরাসটার নাম দিয়েছে হাংগ্রি ডেভিল—ক্ষুধার্ত

www.MurchOna.com

শয়তান। মেমোরি রেসিডেন্ট হয়ে নিজেকে কপি করা শুরু করে কিছুক্ষণের মাঝে হার্ড ড্রাইভ ভরতি করে ফেলে! তারপর—"

"ছোট চাচা!" টিটু উত্তেজিত হয়ে বলে, "তার মানে এটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে পারে, এটা বড় হতে পারে—এটা হুবহু নিজের মতো আরেকটা তৈরি করতে পারে—"

"হ্যাঁ। তা তো পারেই।"

"এটাকে কি কিছু খেতে হয়?"

ছোট চাচা হেসে বললেন, "খাওয়ার অর্থ কী? শক্তি গ্রহণ। সেই অর্থে এটাকেও খেতে হয়, কম্পিউটারের শক্তি থেকেই এটা শক্তি নেয়। এই ভাইরাসটা যখন নিজেকে কপি করে তখন তার জন্যে ইলেকট্রিসিটি খরচ হয় না? সেটাই তার খাবার।"

"বর্জ্য পদার্থ?"

"বর্জ্য?" ছোট চাচা অবাক হয়ে বললেন, "বর্জ্য মানে কী?"

"ওহ্! ছোট চাচা তুমি দেখি কিছুই জান না! প্রাণীদের পেশাব-পায়খানাকে ভদ্র ভাষায় বলে বর্জ্য পদার্থ। এই ভাইরাসটার কি কোনো বর্জ্য পদার্থ আছে?"

ছোট চাচা মাথা চুলকে বললেন, "সেটা তো নিশ্চয়ই আছে। মেমোরির এক লোকেশন থেকে যখন অন্য লোকেশানে যায় তখন আগের লোকেশানে যে-ডাটা থাকে—"

ছোট চাচা কী বলছেন টিটু সেটা কিছু বুঝতে না পারলেও বর্জ্য পদার্থ যে আছে সেটা বুঝে গেল। সে হাতে কিল দিয়ে বলল, "তার মানে এটা একটা সত্যিকারের প্রাণী!"

"সত্যিকারের প্রাণী?"

"হ্যাঁ। আমাদের বইয়ে প্রাণীর যে-সংজ্ঞা দেওয়া আছে তার সব কয়টি মিলে যাচ্ছে!"

ছোট চাচা অবাক হয়ে টিটুর দিকে তাকিয়ে রইলেন, তার উত্তেজনার ঠিক কারণটা ধরতে পারলেন না। একটু অবাক হয়ে বললেন, "তোর বইয়ের সংজ্ঞাটা বদলাতে হবে—কারণ এটা প্রাণী না—এটা একটা কম্পিউটার প্রোগ্রাম!"

টিটু উজ্জ্বল চোখে বলল, "আমি তো সেইটাই বলছি!"

ছোট চাচা হাল ছেড়ে দেওয়ার ভান করে ভললেন, "ঠিক আছে বাবা—তুই কী বলছিস তুইই জানিস।"

টিটু একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "ছোট চাচা!"

www.MurchOna.com

"কী হল?"

"আমাকে এই হাংগ্রি ডেভিল ভাইরাসটা দিতে পারবে?"

"কী করবি?"

"আমার এক স্যারকে দেখাব।"

"ঠিক আছে, নিয়ে যা। তবে মনে রাখিস ভাইরাসটা খারাপ—পুরো সিস্টেম আবার নূতন করে লোড করতে হতে পারে।"

টেবিলের উপরে কম্পিউটারটা রাখা, সব ছাত্র সেটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। জলীল স্যার কম্পিউটারের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন, বাঘ শিকার করে শিকারি ছবি তোলার জন্যে বাঘের উপর যেভাবে পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁর ভঙ্গিটা অনেকটা সেরকম। জলীল স্যার গাম্ভীর মুখে বললেন, "আজকে তোমাদের প্রথম কম্পিউটার ক্লাস। কম্পিউটার কীভাবে চালাতে হয় আমি তোমাদেরকে সেটা দেখাব—তোমরা দেখবে।"

সবাই চুপ করে রইল, শুধু আজমল বলল, "জি স্যার দেখব।"

"কম্পিউটার দিয়ে কী কী করা যায় তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। আমি আরেকবার বলি—"

টিটু এই সময়ে হাত তুলে বলল, "স্যার!"

"কী হল?"

"আমাদের ক্লাসে কম্পিউটার শেখানো হবে শুনে আমার ছোট চাচা একটা চিঠি দিয়েছেন।"

"চিঠি? কোথায়?"

"এই যে স্যার। কম্পিউটার দিয়ে লিখেছেন। ডিস্কেট।"

টিটু পকেট থেকে একটা ডিস্কেট বের করে দিল। স্যার সেটা দেখে মুখে একটা সবজান্তা গম্ভীর ভাব ফুটিয়ে তুললেন। তিনি ডিস্কেটটা হাতে নিয়ে গম্ভীর হয়ে সেটা কম্পিউটারে ঢোকালেন এবং বেশ খানিকটা চেষ্টাচরিত্র করে ছোট চাচার লেখা চিঠিটা কপি করলেন। ছোট চাচা বলেছেন হাংগ্রি ডেভিল ভাইরাসটা তা হলেই কপি হয়ে যাবে। তার মিনিট দশেকের মাঝেই কম্পিউটারের বারোটা বেজে যাবার কথা।

স্যার টিটুকে ডিস্কেটটা ফেরত দেওয়ার সময় টিটু জিজ্ঞেস করল, "স্যার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম কি প্রাণী?"

"কী বললি?"

"কম্পিউটার প্রোগ্রাম কি প্রাণী?"

www.MurchOna.com

স্যার এবারে মুখ খিঁচিয়ে একটা ধমক দিলেন। "আমার সাথে মশকরা? কমফিউটার ফ্রোগ্রাম ফ্রাণী হবে কেন?"

"আপনি বলেছিলেন যেটা নড়াচড়া করতে পারে, যেটা বড় হয়, যেটা বাচ্চা দেয়, যেটা খাওয়াদাওয়া করে, যেটা পেশাব-পায়খানা করে সেইটাই প্রাণী।"

"কম্পিউটার ফ্রোগ্রাম সেটা করে?"

"করে স্যার। ছোট চাচার চিঠির সাথে সেরকম একটা প্রোগ্রাম কম্পিউটারের মেমোরিতে গিয়েছে। সেইটা এখন খাওয়াদাওয়া করছে। পেশাব-পায়খানা করছে। বাচ্চাকাচ্চা দিচ্ছে।"

জলীল স্যার মুখ হাঁ করে টিটুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। সে ঠাট্টা করছে না সত্যি কথা বলছে তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। কিছু-একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। টিটু বলল, "আমার কথা বিশ্বাস না করলে আপনি দেখেন স্যার হার্ড ডিস্কটা ভরে যাচ্ছে।"

জলীল স্যার একবার কম্পিউটারের কাছে গিয়ে কীবোর্ডটা ছুঁয়ে আবার চোখ লাল করে টিটুর দিকে তাকালেন, কী করে হার্ড ডিস্ক দেখতে হয় তিনি ভুলে গেছেন। টিটু বলল, "আপনি না দেখলেও ক্ষতি নাই। কিছুক্ষণ পর যখন পুরো হার্ড ডিস্ক প্রোগ্রামের ছানাপোনা আর বর্জ্য পদার্থ দিয়ে ভরতি হয়ে যাবে তখন কম্পিউটার এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে।"

টিটুর কথা শেষ হবার আগেই কম্পিউটার থেকে একটা বিচিত্র শব্দ হল এবং হঠাৎ করে মনিটরে ইংরেজিতে একটা লেখা ভেসে উঠল, "আমি ক্ষুধার্ত! আমাকে খাবার দাও!"

সবাই অবাক হয়ে কম্পিউটারটির দিকে তাকিয়ে রইল। কেউ কোনো কথা বলল না। শুধুমাত্র আজমল ভয়ে ভয়ে বলল, "স্যার এটা খেতে চাইছে!"

জলীল স্যার রক্তচক্ষু করে টিটুর দিকে তাকালেন। টিটু সেই দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে বলল, "স্যার!"

"কী হল?"

"কম্পিউটার প্রোগ্রাম কি একটা ফ্রাণী? মানে ইয়ে—প্রাণী?"

পুরো ক্লাস পিনপতন স্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে রইল, তার মাঝে কম্পিউটারটা আবার একটা কাতর শব্দ করল।

www.MurchOna.com

হেঁচকি

আজকে সন্ধেবেলা খেলার জন্যে টুটুল আর ঝুমুর একটা খেলা আবিষ্কার করল, খেলাটা খুবই সোজা, শোওয়ার ঘরের বিছানা থেকে বালিশ, কোলবালিশ লেপ-তোশক সবকিছু ছুড়ে ছুড়ে মেঝেতে ফেলে দেওয়া। খেলার বর্ণনা শুনে এটাকে খুব মজার খেলা মনে না হলেও খেলাটি অসম্ভব মজার—যে যত তাড়াতাড়ি নিচে যত বেশি জিনিস ফেলতে পারে সে হয় ফার্স্ট। আর এই খেলায় যে বেশিবার ফার্স্ট হয় তাকে রাত্রিবেলা ঘুমানোর সময় দুধ খেতে হবে না।

এই মজার খেলাগুলি টুটুল আর ঝুমুর প্রত্যেকদিন খেলতে পারে না। আম্মা এরকম খেলা দুচোখে দেখতে পারেন না। তাঁর ধারণা মেঝেতে বালিশ ফেলে দেওয়া খুব নোংরা কাজ। আব্বার কথা তো ছেড়েই দেওয়া যায়, তাঁর ধারণা খেলাধুলা করে শুধু দুষ্টু ছেলেরা, ভালো ছেলেরা সবসময় বসে বসে ইংরেজি ট্রানস্লেশান করবে। কাজেই টুটুল আর ঝুমুর দুই ভাইবোন এই মজার খেলাগুলি খেলতে পারে যখন তাদের আব্বা-আম্মা কোনো বিয়েতে বা অন্য কোথাও বেড়াতে যান আর ছোট চাচা আসেন তাদের দুজনকে দেখেশুনে রাখতে।

ছোট চাচা হচ্ছেন সারা পৃথিবীর মাঝে সবচেয়ে মজার মানুষ। তাঁর চুলগুলি থাকে উশকোখুশকো, তাঁর মুখে থাকে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, তার পরনের টিশার্টটা হয় ঢলঢলে, জিনসের প্যান্টটা হয় ভুসভুসে, পায়ের টেনিস শুটা হয় রং-ওঠা। তাঁকে দেখেই বোঝা যায় যে ছোট চাচা ইউনিভার্সিটির ছাত্র। ছোট চাচায় বগলে সবসময় কয়েকটা বই থাকে, বেশিরভাগই হয়

www.MurchOna.com

খটমটে ইংরেজি। বাসায় এসে ডাইনিং টেবিলে পা তুলে বসে ছোট চাচা বই পড়তে শুরু করেন।

ছোট চাচার সবচেয়ে বড় গুণ হচ্ছে যে তিনি কোনোকিছুতেই না করেন না। টুটুল যদি বলে, "ছোট চাচা, আজ ভাত খেতে ইচ্ছে করছে না, শুধু পেপসি খাব।"

ছোট চাচা তা হলে বলবেন, "ঠিক আছে। সেটাই ভালো—ভাত আবার মানুষ খায় নাকি?"

ঝুমুর যদি বলে, "ছোট চাচা, তোমার ঘাড়ে উঠি?"

ছোট চাচা তা হলে ঘাড় পেতে দিয়ে বলবেন, "নে, ওঠ।"

টুটুল যদি বলে, "ছোট চাচা, আজ রাতে ঘুমাব না, সারারাত বসে বসে টিভিতে মিস্টার বিন দেখব, ঠিক আছে?"

তা হলে চোট চাচা হাতে কিল দিয়ে বলবেন, "ফার্স্ট ক্লাস আইডিয়া! চল এখনই গিয়ে এক ডজন মিঃ বিনের ভিডিও রেন্ট করে আনি।"

ঝুমুর যদি বলে,"ছোট চাচা, আজকে প্ল্যানচেট করে ভূত আনব।"

ছোট চাচা তা হলে চোখ বড় বড় করে বলবেন, "কার ভূত আনা যায়? হিটলারের, নাকি ইয়াহিয়া খানের?"

ছোট চাচা বাচ্চাদের কোনো কথা হেসে উড়িয়ে দেন না। স্কুলে যখন নাটক হয় তখন রাত জেগে রাজপুত্র আর রাজকন্যার মুকুট তৈরি করে দেন। কাগজ কেটে কেটে দৈত্যের মুখোশ তৈরি করে দেন, পার্ট মুখস্থ করিয়ে দেন। যখন সায়েন্স ফেয়ারে দেখানোর জন্যে জ্যান্ত ব্যাঙের দরকার হয় ছোট চাচা সেই বাড্ডা থেকে পলিথিনের ব্যাগে করে ব্যাঙ ধরে নিয়ে আসেন। কাজেই ছোট চাচা যখন বাসায় আসেন তখন টুটুল আর ঝুমুরের যা আনন্দ হয় সেটা আর বলার মতো নয়।

আজকেও যখন আব্বা-আম্মা ছোট চাচাকে বাসায় রেখে একটা গানের অনুষ্ঠান দেখতে গেলেন তখন টুটুল আর ঝুমুরের খুব আনন্দ হল। আব্বা আর আম্মা ঘর থেকে বের হওয়া মাত্র টুটুল বলল, "আজকে পড়ব না ছোট চাচা।"

ছোট চাচা হাতে কিল দিয়ে বললেন, "ভেরি গুড আইডিয়া।"

"আজকে বালিশ ছোড়াছুড়ি খেলব।"

ছোট চাচা মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "ফার্স্ট ক্লাস খেলা।"

ঝুমুর বলল, "তুমি খেলবে, ছোট চাচা?"

ছোট চাচা বললেন, "তোরা শুরু কর, যদি দরকার হয় খেলব।"

তখন টুটুল আর ঝুমুর চিৎকার করতে করতে খেলা শুরু করে দিল। টুটুল আর ঝুমুর একেবারে পিঠাপিঠি ভাইবোন, তাই খেলতে খেলতে মাঝে

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

মাঝেই দুজনের মাঝে ঝগড়া লেগে যায়। ঝুমুর ছোট কিন্তু তার তেজ বেশি, কিছু-একটা হলেই সে বাঘের মতো খামচি দিয়ে দেয়। আজকেও খেলার মাঝখানে হঠাৎ টুটুলের নাকে খামচি দিয়ে দিল। টুটুল তখন কাঁদতে কাঁদতে এল ছোট চাচার কাছে নালিশ করতে। এসে দেখল ছোট চাচা টেবিলে পা তুলে বসে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছেন, টুটুলকে দেখে বললেন, "কীরে টুটুল, তুই কাঁদছিস কেন?" তারপর হঠাৎ হেঁচকি তুলে বললেন, "হিঁক।"

টুটুল তখন কান্না থামিয়ে বলল, "ছোট চাচা, তোমার হেঁচকি হয়েছে।"

ছোট চাচা মাথা নেড়ে বললেন, "হিঁক।"

"হেঁচকি কেন হয় ছোট চাচা?"

"জানি না। হিঁক। পেটের মাঝে মনে হয় একটা বড় ব্যাঙ থাকে। হিঁক। সেই ব্যাঙ যখন রেগে যায় তখন পেটের মাঝে লাথি মারে। হিঁক।"

টুটুল হিহি করে হেসে বলল, "তোমার পেটের মাঝে ব্যাঙ। হি হি হি। তুমি ব্যাঙ খেয়েছ ছোট চাচা। হি হি হি।"

টুটুল কাঁদতে কাঁদতে নালিশ করতে এসে এখন কী দেখে হাসছে সেটা দেখার জন্যে ঝুমুরও চলে এল। বয়সে ছোট হলেও দুষ্টুমি বুদ্ধিগুলি তার মাথায় খুব ভালোভাবে আসে। সে ছোট চাচাকে হেঁচকি তুলতে দেখে বলল, "ছোট চাচা, তোমার হেঁচকি ভালো করে দিই?"

"কেমন করে দিবি? হিঁক।"

"পানি খেতে হবে তোমার।"

ছোট চাচা ডাইনিং-টেবিলের উপর রাখা খালি গ্লাস দেখিয়ে বললেন, "এই দ্যাখ। হিঁক। দুই গ্লাস পানি খেয়ে ফেলেছি। হিঁক। এখন পেটের ভিতরে পানি কেমন জানি ঢলঢল করছে নদীর মতো। হিঁক।"

টুটুল বলল, "তুমি কিছু জান না ছোট চাচা।"

"কেন? কী হয়েছে? হিঁক।"

"পানি খেতে হয় গ্লাসের উলটোদিক দিয়ে, এই দ্যাখো, এইভাবে।"

টুটুল তখন পানির গ্লাস হাতে নিয়ে পানি খেতে হলে যেখানে ঠোঁট লাগাতে হয় সেখানে না লাগিয়ে গ্লাসের উলটোদিকে ঠোঁট লাগিয়ে বলল, "এইভাবে।"

"এইভাবে আবার কেমন করে পানি খাব? হিঁক। থুতনি তো গ্লাসের মাঝে ঢুকে যাবে। হিঁক।"

টুটুল হিহি করে হেসে বলল, "এইভাবেই খেতে হবে ছোট চাচা। এইটাই নিয়ম—সবকিছুর নিয়ম থাকে।"

www.MurchOna.com

তখন ঝুমুরও হাততালি দিয়ে বলল, "এইভাবে, এইভাবে।"

ছোট চাচা না হয়ে অন্য কোনো বড় মানুষ হলে কখনো এভাবে গ্লাস থেকে পানি খেত না, কিন্তু ছোট চাচা বাধ্য ছেলের মতো গ্লাসটা হাতে নিয়ে উলটো দিক দিয়ে পানি খাবার চেষ্টা করলেন। প্রথমেই ছোট চাচার থুতনি ভিজে গেলা, পানি খাবার জন্যে গ্লাসটা আরেকটু কাত করতেই হঠাৎ খানিকটা পানি তাঁর নাকে ঢুকে গেল। ছোট চাচা ফ্যাঁচ করে হেঁচে উঠলেন, পানি ছলকে পড়ল তাঁর কাপড়ে, ভিজে একশা হয়ে গেলেন ছোট চাচা। তাই দেখে আনন্দে হিহি করে হেসে গড়িয়ে পড়ল দুই ভাইবোন।

ছোট চাচা খুব রেগে যাবার ভান করে বললেন, "হিঁক। আগে শুধু হেঁচকি ছিল, এখন হল হাঁচি আর হেঁচকি! হিঁক।"

ছোট চাচা রুমাল দিয়ে জামাকাপড় মুছে বললেন, "আসলে মানুষ চমকে উঠলে হেঁচকি বন্ধ হয়ে যায়। হিঁক। দেখি তো, তোরা আমাকে চমকে দিতে পারিস কি না! হিঁক।"

তখন টুটুল আর ঝুমুরের ভারি মজা হল, দুজনে মিলে তখন ছোট চাচাকে চমকে দেবার জন্যে বুদ্ধি বের করতে শুরু করল। পিছন থেকে ছুটে এসে "বু-ও-ও-ও-ও" বলে চেঁচিয়ে উঠল, হঠাৎ করে ঘরের লাইট নিভিয়ে দিল, মুখোশ পরে পিছন থেকে লাফিয়ে পড়ল ছোট চাচার উপরে, রবারের একটা সাপ ছুড়ে দিল ছোট চাচার ঘাড়ে, ছোট চাচা একবারও চমকালেন না। টুটুল তখন একটা ঠোঙা নিয়ে এসে ছোট চাচার কানের কাছে বিকট শব্দ করে ফাটিয়ে দিল, ছোট চাচা তখন চমকে উঠে বললেন, "আরে! আরে! করছিস কী? আমাকে চমকে দিতে বলেছি—কানের পর্দা তো ফাটাতে বলি নি!"

ছোট চাচার কথা শেষ হবার আগেই ঝুমুর এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি এনে ছোট চাচার উপরে ঢেলে দিল—এবারে সত্যি সত্যি ভয়ানক চমকে উঠে একেবারে লাফিয়ে উঠলেন, চিৎবার করে বললেন, "আরে, আরে! কী করলি? কী করলি?"

হাসতে হাসতে ঝুমুর আর টুটুলের একেবারে চোখে পানি এসে গেল, তারা পেট চেপে হাসতে হাসতে মেঝেতে শুয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। অন্য কেউ হলে এতক্ষণে রেগেমেগে আগুন হয়ে যেত, কিন্তু ছোট চাচা একেবারেই রাগ হলেন না, গ্লাসের বাকি পানিটা দুজনের উপর ঢেলে দেবার ভঙ্গি করলেন আর তাই দেখে দুজনে চিৎকার করে সারা ঘর ছোটাছুটি করতে লাগল।

খানিকক্ষণ পর টুটুল আর ঝুমুর ছোট চাচার কাছে ফিরে এসে বলল, "ছোট চাচা, তোমার হেঁচকি গিয়েছে?"

www.MurchOna.com

ছোট চাচা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হাসিমুখে বললেন, "মনে হয় গিয়েছে। এই দ্যাখ কোনো হেঁচকি নেই।" ছোট চাচার কথা শেষ হবার আগেই অবিশ্যি হঠাৎ হিঁক করে একটা হেঁচকি বের হয়ে এল, তারপর একটার পর একটা বের হতেই থাকল।

টুটুল বলল, "তার মানে চমকে উঠলেও হেঁচকি দূর হয় না।"

ঝুমুর বলল, "আরও বেশি করে চমকাতে হবে। ঠাণ্ডা পানি না দিয়ে চা দিলে মনে হয় ভালো হত।"

ছোট চাচা চোখ পাকিয়ে বললেন, "হিঁক। তোরা আমার হেঁচকি দূর করার জন্যে যত অত্যাচার করেছিস এখন মনে হচ্ছে হেঁচকি থাকাই ভালো। হিঁক।"

"আমাদের কেন দোষ দিচ্ছ ছোট চাচা?" ঝুমুর বলল, "তুমিই বলেছ চমকে দিতে। বল নাই?"

ছোট চাচা মাথা নেড়ে বললেন, "তা ঠিক। হিঁক।"

অন্য কোনো বড় মানুষ হলে কখনোই নিজের দোষ স্বীকার করত না, কিন্তু ছোট চাচার কথা আলাদা, ছোট চাচা সবসময় সব দোষ মেনে নেন। এই দিক দিয়ে ছোট চাচা বাচ্চাদের থেকেও ভালো।

চোট চাচা খানিকক্ষণ মুখ গম্ভীর করে বসে থেকে অনেকগুলি হেঁচকি তুলে বললেন, "মনে পড়েছে। হিঁক।"

"কী মনে পড়েছে?"

"একসাথে অনেকখানি চিনি গিলে খেয়ে ফেললে নাকি হেঁচকি বন্ধ হয়ে যায়। হিঁক।"

"কেন ছোট চাচা?"

"খাওয়ার সময় গলার মাঝে চিনির রসে কী নাকি একটা ব্যাপার হয়। যা দেখি, এক চামুচ চিনি নিয়ে আয়।"

টুটুল আর ঝুমুর তখন চিনি আনতে গেল। টেবিলের উপর চিনি নেই, খাবার ঘরেও নেই, রান্নাঘরেও সেটা খুঁজে পাওয়া গেল না। ঝুমুর বলল, "মনে হয় তাকের উপর আছে।"

তাক অনেক উঁচু, টুটুল আর ঝুমুর কেউই নাগাল পেল না। খাবার ঘর থেকে একটা চেয়ার এনে তার উপরে দাঁড়িয়েও লাভ হল না। টুটুল তখন ঝুমুরকে বলল, "তুই চেয়ারটা শক্ত করে ধর। আমি হাতলের উপর দাঁড়াই।"

টুটুল যখন খুব সাবধানে হাতলের উপর দাঁড়িয়েছে ঠিক তখন কারেন্ট চলে গেল। কারেন্ট চলে গেলেও বাইরের ঘরে একটু আলো থাকে, কিন্তু

www.MurchOna.com

রান্নাঘরে কী ঘুটঘুটে অন্ধকার! অন্ধকারে চেয়ারের হাতলে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ টুটুলের মনে হল সবকিছু পড়ে যাচ্ছে। সে সত্যি সত্যি তাল হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, নিজেকে সামলানোর জন্যে সে তাকের উপর কিছু-একটা ধরতে গেল, সেগুলিসহ সে উপর থেকে আছাড় খেয়ে পড়ল নিচে। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল ঝুমুর, তখন চেয়ারসহ, তাকের সব জিনিসপত্র, শিশি, বোতল, কৌটা, ছুরি, চাকু সবকিছু নিয়ে হুড়মুড় করে নিচে এসে পড়ল। ভয়ংকর একটা শব্দ হল, মনে হল পুরো বাসার ছাদ বুঝি ধসে পড়েছে নিচে। টুটুল আর ঝুমুর চিৎকার করে উঠল যন্ত্রণায়, তাদের মনে হল বুঝি তারা মরেই গেছে যন্ত্রণায় আর ভয়ে।

ছোট চাচা ভয়ংকর শব্দ শুনে, "কী হয়েছে? কী হয়েছে?" বলে চিৎকার করতে করতে অন্ধকারে রান্নাঘরে ছুটে আসতে গিয়ে ডাইনিং-টেবিলে পা বেঁধে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলেন। কোনোমতে নিজেকে সামলে নিয়ে হাতড়ে হাতড়ে রান্নাঘরে এসে হাতিয়ে হাতিয়ে অন্ধকারে চুলার কাছে থেকে খুঁজে খুঁজে ম্যাচ বের করলেন। কাঁপা-হাতে একটা ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে যা দেখলেন তাতে ভয়ে তাঁর আত্মা উড়ে গেল। টুটুল আর ঝুমুর দুজন জড়াজড়ি করে একজনের উপর আরেকজন পড়ে আছে, তাদের উপর চেয়ার, রাজ্যের জিনিসপত্র, ভাঙা শিশি-বোতল, বাসনপত্র। ছোট চাচা ছুটে গিয়ে তাদেরকে টেনে তুললেন, ভয়-পাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যথা পেয়েছিস নাকি? টুটুল? ঝুমুর?"

দুজনে গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগল, ব্যথা সত্যিই পেয়েছে, কিন্তু কতটুকু পেয়েছে সেটা এখনও বুঝতে পারছে না। ছোট চাচা হাতড়ে হাতড়ে মোমবাতি বের করে জ্বালালেন, তারপর দুজনকে পরীক্ষা করে বললেন, "ছাল-চামড়া উঠে গেছে, হাত-পা ভাঙেনি। খুব বেশি ব্যথা পাস নাই মনে হয়।"

ঝুমুর হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "পেয়েছি ছোট চাচা।"

"তা পেয়েছিস, এই যে, কপালটা ফুলে গেছে।"

টুটুল বলল, "আমার মনে হয় ঘাড় ভেঙে গেছে চোট চাচা।"

"না, ঘাড় ভাঙে নাই। ছাল উঠে গেছে, ধুয়ে একটু অ্যান্টিসেপটিক লাগিয়ে দেব, ঠিক হয়ে যাবে।"

টুটুল ফ্যাঁসফ্যাঁস করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, "ব্যথা করবে না তো?"

"করলে করবে। ব্যথাকে ভয় পেলে চলবে নাকি?"

ঝুমুর কাঁদতে কাঁদতে চারিদিকে তাকিয়ে বলল, "এখন কী হবে?"

"কিসের?"

www.MurchOna.com

"আম্মু যখন দেখবে রান্নাঘরের এই অবস্থা!"

ছোট চাচা আঙুলে তুড়ি দিয়ে বললেন, "আম্মু কেমন করে দেখবে? তোর আম্মু আসার আগে সব পরিষ্কার করে ফেলব না?"

টুটুল চারিদিকে তাকিয়ে বলল, "পারবে পরিষ্কার করতে? কয়টা শিশি ভেঙেছে দেখেছ? আচারের বোতল। ঘিয়ের বয়াম।"

ছোট চাচা হাত নেড়ে বললেন, "নো প্রবলেম। তিনজনে মিলে হাত লাগাব, তিন মিনিটে ঘর পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

টুটুল চোখ মুছল, ছোট চাচা যদি বলেন হয়ে যাবে তা হলে সেটা সত্যি হয়ে যাবে।

"কাঁদিস না আর। আয় দুজনে আমার কাছে।" ছোট চাচা দুজনকে নিজের কাছে টেনে আনলেন। বললেন, "তোদেরকে একটু বুকে চেপে রাখি। ইশ! যা ভয় পাইয়েছিলি! মা গো!"

টুটুল আর ঝুমুর ছোট চাচার প্রশস্ত বুকে মুখ লুকাল, তাদের শরীরে তেল আর আচার লেগে আছে, সেটা নিয়ে ছোট চাচা একটুও মাথা ঘামালেন না, দুজনকে শক্ত করে ধরে রাখলেন। হঠাৎ ঝুমুর মুখ তুলে বলল, "ছোট চাচা!"

"কী হল?"

"তোমার হেঁচকি?"

ছোট চাচা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বললেন, "তাই তো! আমার হেঁচকি! কোথায় গেল আমার হেঁচকি?"

"পালিয়ে গেছে! পালিয়ে গেছে!"

"তোদের ধুমধাড়াক্কা শুনে একেবারে জানের ভয়ে পালিয়ে গেছে হেঁচকি।"

টুটুল চিৎকার করে বলল, "পালিয়ে গেছে! পালিয়ে গেছে!"

ঠিক তখন কারেন্ট চলে এল। ছোট চাচা তখন টুটুল আর ঝুমুরকে দেখে হাসতে লাগলেন। টুটুল আর ঝুমুরও তখন হাসতে লাগল। কেন যে সবাই হাসছে কেউ ঠিক করে জানে না, কিন্তু হাসার জন্যে কারণ থাকতে হবে সেটা আর কোন বইয়ে লেখা আছে?

www.MurchOna.com

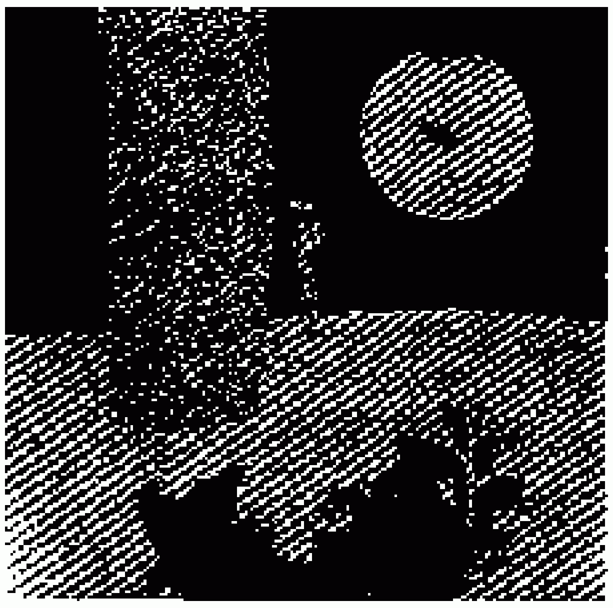

নূপুর

ব্যাপারটি শুরু হয়েছে এইভাবে।

পিয়ালদের বাসায় শওকত মামা বেড়াতে এসেছেন। শওকত মামা এম.এস-সি. পাশ করে এখন পুরোপুরি বেকার। ডাটা এন্ট্রি, স্টক মার্কেট, ইন্টারনেট এইরকম সহজ পদ্ধতিতে বড়লোক হওয়ার চেষ্টা করে সবগুলিতে ধরা খেয়ে এখন ধর্মকর্ম এবং আধিভৌতিক ব্যাপারে মনোযোগ দিয়েছেন। রাত্রে সবাই মিলে এক্স-ফাইল দেখছিল, জমজমাট একটা ভৌতিক দৃশ্যে (হাত-পা নেই বিদঘুটে একটা ভূতের মাথা মোল্ডারের পা প্রায় কামড়ে ধরছে) হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। আব্বা বললেন, "ভালোই হল—এই গাঁজাখুরি আর কত দেখা যায়!"

আম্মা বললেন, "এগুলি দেখে মানুষ যে কী মজা পায়! খামোকা বাচ্চাকাচ্চাদের রাত্রে ভয় দেখানো!"

পিয়ালের ছোট বোন টুশকি বলল, "ইশ! কী কিউট ছিল ভূতটা! যা মায়া লাগে দেখলে!"

এক্স-ফাইল দেখে ভয়ে পিয়ালের হাত-পা শরীরের ভিতর ঢুকে যাচ্ছিল, ইচ্ছে হল অন্ধকারে টুশকির মাথায় একটা রদ্দা লাগায়, অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিল।

শওকত মামা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "এইসব নকল ভূত দেখে চোখ পচে গেল। সত্যিকারের একটা ভূত পেতাম, দেখতাম—"

আব্বা বললেন, "সত্যিকারের ভূত কি হিন্দি সিনেমার ভিডিও নাকি যে ইচ্ছে করলেই মোড়ের দোকান থেকে রেন্ট করে আনবে?"

www.MurchOna.com

শওকত মামা বললেন, "আমি কি তা-ই বলেছি? কেউ যদি বলে আমাকে সত্যিকারের ভূত দেখাতে পারবে, পাহাড় নদী ডিঙিয়ে চলে যাব। দরকার হলে লাখ-দুই লাখ টাকা খরচ করে ফেলব।"

আব্বা বললেন, "ভূত দেখার জন্যে পাহাড় নদী ডিঙাতে হয় না—আর তোমার চাকরিবাকরি নাই লাখ-দুই লাখ খরচ করবে কেমন করে? ভূত দেখার জন্যে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সাহস।"

শওকত মামা জিজ্ঞেস করলেন, "বলতে চাচ্ছেন আমার সাহস নাই?"

আব্বা কিছু বললেন, না, অন্ধকার বলে মুচকি হাসলেন কি না সেটাও দেখা গেল না।

শওকত মামা এবারে মেঘস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি বলছেন দুলাভাই আমার সাহস নাই?"

"আমি কী বললাম তাতে কী আসে যায়? সাহস থাকলে আছে, না থাকলে নাই।"

"আপনি যদি চান আমি লাশকাটা-ঘরে রাত কাটাতে পারি। বাজি ধরবেন?"

"আজকালকার লাশকাটা-ঘরে থাকা কঠিন কী? ইলেকট্রিক লাইট-ফ্যান-কর্মচারী কম্পিউটার! সাহস থাকলে যাও রতনপুরের রাজবাড়িতে, এক রাত কাটিয়ে আসো।"

"কী আছে সেই রাজবাড়িতে।"

"কী নেই? বাদুড় চামচিকা তেলাপোকা শেয়াল খাটাস বনবেড়াল—তবে জোছনারাতে রাজবাড়ির সামনে বড় দিঘি আছে সেখানে নাকি পরীরা সাঁতার কাটতে আসে। সাহস থাকলে দেখে আসো।"

শওকত মামা শক্ত গলায় বললেন, "ঠিক আছে, পরের পূর্ণিমাতেই যাচ্ছি। আপনার ভিডিও ক্যামেরাটা দেন, পুরো পরীর নাচ ভিডিও করে আনব।"

"ভিডিও করতে হবে না। দাঁতে দাঁত লেগে হার্টফেল না করলেই হল।"

ঠিক এরকম সময়ে ইলেকট্রিসিটি চলে এল, অন্ধকারে পরিত্যক্ত রাজবাড়ির সামনের বিশাল দিঘিতে জোৎস্নারাতে পরীরা নেমে আসছে দৃশ্যটির কথা চিন্তা করে যেরকম গা-ছমছম করছিল, ঘরের আলো জ্বলে যাবার পর সেটাকে আর এত ভয়ের মনে হল না। পিয়াল বলল, "শওকত মামা, আমাকে নেবে তোমার সাথে?"

শওকত মামা মুখ শক্ত করে বললেন, "তোর আব্বা ভাববে একা একা ভয় পাই বলে তোকে নিচ্ছি—না হলে নিতাম।"

"নাও-না, প্লীজ! আমি কোনোদিন পরী দেখি নাই।"

টুশকি বলল, "আমিও যাব আমিও যাব। পরী কী কিউট! কী মায়া লাগে!"

টেলিভিশনে আবার এক্স-ফাইল শুরু হয়ে গেল বলে ব্যাপারটা আপাতত চাপা পড়ে গেল। রাতে ঘুমানোর সময় শওকত মামা পঞ্জিকা দেখে খোঁজ নিয়ে এলেন যে পরের শনিবার পূর্ণিমা। পরদিন সকালে খোঁজ নিয়ে এলেন যে, রতনপুরে বাস সার্ভিস আছে, সকালে রওনা দিলে দুপুরের মাঝে পৌঁছে যাবে—সত্তর টাকা ভাড়া। বিকালবেলার মাঝে খোঁজ নিয়ে এলেন সেখানে রতনপুর বোর্ডিংহাউস বলে একটা থাকার জায়গা আছে, প্রতি সিট কুড়ি টাকা। রাতের মাঝে শওকত মামা রতনপুর রাজবাড়িতে পরী দেখতে যাওয়ার প্রোগ্রাম পাকা করে ফেললেন। যখন দেখা গেল সত্যিই শওকত মামা রাজবাড়ির দিঘিতে পরীদের সাঁতারকাটা দেখতে যাচ্ছেন তখন পিয়ালও ধরে বসল সেও যাবে। প্রথমে ভেবেছিল আব্বা বুঝি রাজি হবেন না, কিন্তু দেখা গেল খুব সহজেই রাজি হয়ে গেলেন। যাবার সময় শুধু বললেন, "তোর মামাকে দেখে রাখিস। আর শোন—খাওয়াদাওয়া নিয়ে খুব সাবধান। রান্না করা জিনিস ছাড়া কিছু খাবি না।"

আব্বা এত সহজে রাজি হয়ে গেলেন দেখেই পিয়াল বুঝতে পেরেছিল জায়গাটা নিশ্চয়ই খুব নিরীহ কিছু হবে। রতনপুরে পৌঁছে দেখল তার সন্দেহটা সত্যি। যে-জিনিসটার নাম রাজবাড়ি সেখানে কোনো বাড়ি নেই, খানিকটা পুরানো ভিটে পড়ে আছে। যে-দিঘিতে পরীদের সাঁতারকাটার কথা সেটা একটা ছোট পুকুরের মতন, এক সময় হয়তো বড় ছিল, মজে গিয়ে ছোট হয়ে গেছে। পুকুরের একপাশে বাঁধানো ঘাট আছে, ফাঁক-ফোকর দিয়ে অশ্বত্থ গাছ বের হয়ে এসেছে। তবে জায়গাটা নির্জন, আশে-পাশে ধানিজমি আছে, একপাশে ছোট একটা চালাঘরের মতো আছে। কিছু ছোট ছোট বাচ্চা বিশাল বিশাল গোরু চড়িয়ে নিচ্ছিল। শওকত মামা তাদের কাছেও খোঁজখবর নিলেন। এই দিঘিতে পরী নেমে আসে সে-ব্যাপারে কেউ কিছু জানে বলে মনে হল না।

সন্ধেবেলা রতনপুরের বিখ্যাত বোর্ডিংহাউস দেখে পিয়াল এবং শওকত মামা দুজনেই ভিরমি খেলেন। ছোট অন্ধকার একটা রুমে ছয়টা তক্তপোশ পাতা—প্রতি তক্তপোশে তেলচিটচিটে তোশক গুটিয়ে রাখা আছে। ঘরের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় তার টানানো, সেই তার থেকে মশারি ঝুলছে। দিনের বেলাতেই ঘর অন্ধকার, ভিতরে একটা বোটকা গন্ধ, শওকত মামা বললেন বিড়ি এবং সিগারেটের, পিয়ালের ধারণা এই ঘরটি নিশ্চয়ই শুঁটকিমাছের আড়ত হিসেবে ব্যবহার হয়। বোর্ডিংহাউসটা যদি ভদ্রগোছের কিছু হত তা হলে পরীর নাচ দেখার প্রোগ্রাম বাতিল করে সেখানে রাত কাটানোর একটা সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সেটি একবার দেখার পর রাজবাড়িতে দিঘির পাড়ে সারারাত বসে থাকাটা এমন-কিছু কঠিন মনে হল না।

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

শওকত মামা পিয়ালকে নিয়ে বিকালবেলা একটা রেস্টুরেন্টে ভরপেট খেয়ে রাজবাড়িতে হাজির হলেন। তাদের সাথে একমাত্র অস্ত্র ছয়-ব্যাটারির বড় টর্চলাইট। সেটা বড় এবং ওজনদার, লাঠি হিসেবে ব্যবহার করা এমন-কিছু কঠিন নয়। রাজবাড়ির পাশে যে-চালাঘরটা আছে সেটা মোটামুটি পরিষ্কার, পিয়াল আর শওকত মামা মিলে সেটাকে ঝেড়েপুছে আরও পরিষ্কার করে নিল। সন্ধে হওয়ার আগেই পুরো জায়গাটা ভালো করে একবার ঘুরে এসে তারা চালাঘরে হাজির হল। ঘরের মেঝেতে একটা চাদর বিছিয়ে নিয়ে তার উপর দুজন আসন করে বসেছে। ঠিক সন্ধেবেলা পূর্ণিমার চাঁদ ওঠার পর যেরকম চারিদিকে জোৎস্না ছড়িয়ে পড়ার কথা সেরকম কিছু হল না। পুকুরপাড় কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার রয়ে গেল—বাঁশঝাড় গাছগাছালি ভেদ করে চাঁদের আলো আসতে পারছিল না। চারিদিকে সুমসাম নীরবতা, তার মাঝে পিয়াল ফিসফিস করে বলল, "মামা, এত অন্ধকারে পরী দেখব কেমন করে?"

"রাত আরেকটু গভীর হোক, চাঁদ উপরে উঠে এলে দেখবি চারিদিক আলো হয়ে যাবে।"

শওকত মামার কথা সত্যি, খানিকক্ষণ পর চাঁদ একটু উপরে উঠে আসতেই হঠাৎ জোৎস্নার নরম আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পুকুরঘাট গাছপালা ঝোপঝাড় চাঁদের আলোতে স্পষ্ট হয়ে উঠল। চাঁদের আলোটি মনে হয় খুব চিন্তাভাবনা করে তৈরি করা হয়েছে, যদিও সবকিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তবুও সবকিছু কেমন যেন অস্পষ্ট এবং রহস্যময়। একটি জিনিস কেমন করে একই সাথে স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট হতে পারে পিয়াল ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

রাত গভীর হবার পর নতুন একটি সমস্যা দেখা গেল, সেটা হচ্ছে মশা। এই এলাকায় মশা সম্ভবত কয়েক যুগ থেকে অভুক্ত, হঠাৎ করে এরকম তাজা দুজন মানুষ পেয়ে তাদের মাথা-খারাপ হয়ে গেল। বুদ্ধি করে একটা মশার কয়েল নিয়ে এলে হত, কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। শরীরের পুরোটা ভালো করে ঢেকে দুজন বসে রইল। তবুও মশার কামড় থেকে রক্ষা পাবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। শুধুমাত্র মেয়ে-মশারা নাকি রক্ত খায়, যদি পুরুষ-মশারাও রক্ত খেত তা হলে কী বিপদ হত কে জানে!

ধীরে ধীরে রাত আরও গভীর হতে থাকে। চারিদিকে সুমসাম নীরবতা বলে অনেক রকম শব্দ হঠাৎ করে খুব স্পষ্টভাবে শোনা যেতে থাকে। ঝিঁঝিপোকার ডাক যে এত কর্কশ সেটা পিয়াল এর আগে কখনো লক্ষ করেনি। খুব হালকা বাতাসেও নারকেল গাছের পাতার মাঝে একধরনের শিরশির শব্দ হয় সেটাও পিয়াল জানত না। যত ছোটই হোক শুকনো পাতার উপর দিয়ে যে কোনো প্রাণী নিঃশব্দে যেতে পারে না সেটাও পিয়াল

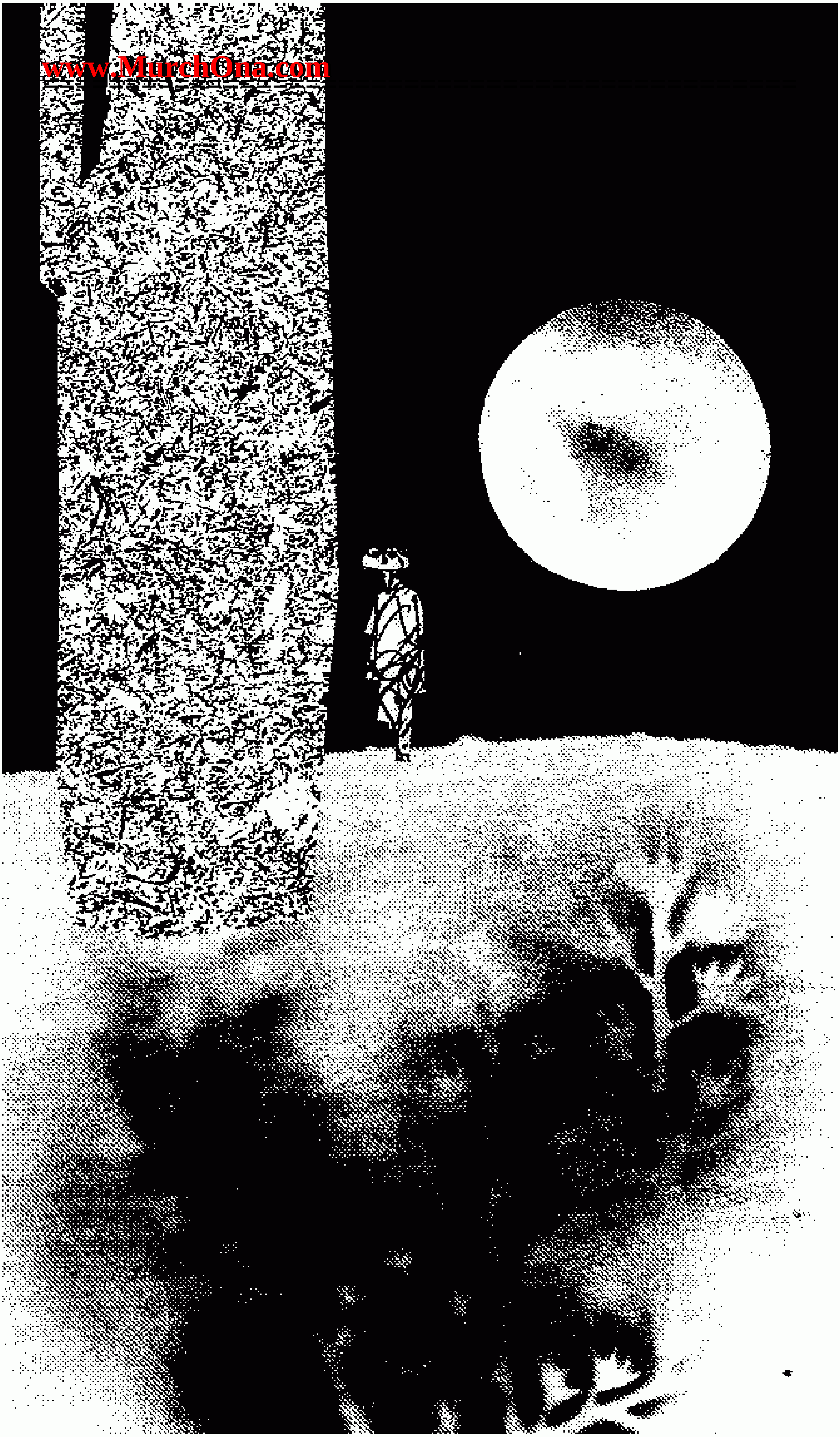

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

এই প্রথমবার আবিষ্কার করল। জোছনার নরম আলোতে রাতের বিচিত্র সব শব্দ শুনতে শুনতে পিয়াল কেমন জানি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ঠিক কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে সে নিজেও জানে না।

পিয়ালের হঠাৎ করে ঘুম ভাঙল, কেন ভাঙল সে জানে না। ঘুমানোর আগে সে মশার গুনগুন, ঝিঁঝিপোকার ডাক, গাছের পাতার শিরশির শব্দ, নিশাচর পাখির ডাক শুনতে শুনতে ঘুমিয়েছে কিন্তু এখন কোথাও কোনো শব্দ নেই। চারিদিকে খুব আশ্চর্য একধরনের নৈঃশব্দ, এই নৈঃশব্দের মাঝে কেমন জানি একধরনের একটা আতঙ্ক আতঙ্ক ভাব, মনে হয় একটা ভয়ানক কিছু ঘটবে। পিয়ালের ভিতরে একধরনের চাপা ভয় এসে ভর করে এবং ঠিক তখন সে খুব মৃদু একধরনের নূপুরের শব্দ শুনতে পেল। পিয়াল চমকে ওঠে, শব্দটা আসছে ওপর থেকে। শওকত মামা চাদর-মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি মেরে ঘুমাচ্ছেন, তাঁকে ডেকে তুলবে কি না সে বুঝতে পারল না। নূপুরের শব্দটা আরও একটু স্পষ্ট হল এবং পিয়াল হঠাৎ নূপুরের সাথে সাথে মেয়ের গলায় হাসির শব্দ শুনতে পেল, শব্দটা আসছে আকাশ থেকে। পিয়াল গুটিসুটি মেরে চালাঘরের দরজা দিয়ে মাথা বের করে আকাশের দিকে তাকায় এবং হঠাৎ করে তার সারা শরীর জমে যায়। আকাশে জোছনা-আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ধবধবে সাদা কিছু পরী উড়তে উড়তে নেমে আসছে। তাদের পাখা নড়ছে খুব মৃদুভাবে, শরীরে হালকা স্বচ্ছ একধরনের কাপড়, বাতাসে উড়ছে। শরীরের কোথায় জানি নূপুর বাঁধা আছে, মিষ্টি টুং টাং শব্দ ভেসে আসছে সেখান থেকে।

কিছুক্ষণ আগে বুকের ভিতর যে চাপা ভয় ছিল হঠাৎ সেই ভয় কেটে যায় পিয়ালের, হঠাৎ করে মনে হয় সে বুঝি ছুটে যেতে পারবে বাইরে, হাত তুলে ডাকতে পারবে পরীদের। কিন্তু পিয়াল তার কিছুই করল না, চালাঘরের দরজায় নিঃশব্দে বসে রইল।

পরীগুলো ভাসতে ভাসতে, কথা বলতে বলতে, নিজেদের মাঝে হাসাহাসি করতে করতে নিচে নেমে এল। পুকুরঘাটে একজন একজন করে নেমে এসে তারা হাত-ধরাধরি করে ঘুরতে থাকে, নিজেদের মাঝে এখনও কথা বলছে, স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে পিয়াল, কিন্তু কী নিয়ে কথা বলছে সেটা বুঝতে পারছে না। যেটুকু কথা বলে তার চাইতে হাসে অনেক বেশি—হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের গায়ে ঢলে পড়ে আদুরে মেয়েদের মতো। পিয়াল নিশ্বাস বন্ধ করে তাকিয়ে রইল। পুকুরের সামনে ফাঁকা জায়গাটায় হাঁটাহাঁটি করে তারা একটু ছড়িয়ে পড়ে, পুকুরঘাটে গাছপালার মাঝে খোঁজাখুঁজি করে ফুল কুড়াতে থাকে। মানুষের যেরকম উঁচুতে কিছু-একটা ধরার জন্যে দুই হাত উঁচু করতে হয় তাদের সেরকম কিছুই করতে হচ্ছে না। যখনই দরকার হচ্ছে পাখা নাড়িয়ে ভেসে উঠছে উপরে। পিয়াল

www.MurchOna.com

অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে, ব্যাপারটি যে ঘটছে সেটা তার বিশ্বাসই হতে চায় না।

পরীগুলি ফুল তুলতে তুলতে গুনগুন করে গান গাইতে থাকে, কী মিষ্টি গলার স্বর! সবচেয়ে বিচিত্র তাদের গানের সুর—আগে কখনো পিয়াল এরকম সুর শোনেনি, বুকের ভিতরে কেমন জানি একধরনের কাঁপুনি হতে থাকে। একই সাথে আনন্দের এবং বিষাদের সুর।

পরীগুলি গান গাইতে গাইতে দিঘির ঘাটে এসে একত্র হতে শুরু করে, গায়ের কাপড় ঘাটে খুলে রেখে দিঘির পানিতে পা ডুবিয়ে বসে আবার বিচিত্র গলায় কথা বলতে থাকে, কথাগুলি শোনা গেলেও বোঝা যায় না, অনেকটা জোছনার আলোর মতো যেখানে সবকিছু দেখা গেলেও অস্পষ্ট রহস্যময় রয়ে যায়।

ঠিক এরকম সময় শওকত মামা ঘুমের মাঝে নড়েচড়ে ওঠেন। শওকত মামা বিড়বিড় করে কিছু বললেন। জোরে কিছু-একটা বলে পরীদের ভয় না দেখিয়ে দেন ভেবে পিয়াল চাপা গলায় ডাকল, "মামা!"

শওকত মামা চোখ খুলে তাকিয়ে বললেন, "কী?"

"পরী এসেছে মামা।"

শওকত মামা ধড়মড় করে উঠে বসলেন, চিৎকার করে কিছু-একটা বলে ফেলছিলেন প্রায়—পিয়াল প্রায় লাফিয়ে মামার মুখ চেপে ধরল। মামা ভয়-পাওয়া গলায় বললেন, "কো-কো-কোথায় পরী?"

"ঐ যে! দিঘির ঘাটে।" মামা দিঘির ঘাটের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হতচকিত হয়ে গেলেন, তাঁর হাত-পা কাঁপতে লাগল, মুখ দিয়ে কেমন যেন চাপা গোঙানির মতো শব্দ হতে লাগল। পিয়াল শওকত মামাকে ধরে ফিসফিস করে বলল, "মামা, শব্দ কোরো না। পরী উড়ে যাবে।"

মামা তবুও কেমন জানি গোঙাতে গোঙাতে ছয়-ব্যাটারির টর্চলাইটা হাতে নিয়ে কিছু বোঝার আগেই দিঘির ঘাটের দিকে জ্বালিয়ে ধরলেন। তীব্র চোখধাঁধাঁনো আলোতে চারিদিকে ধবধব করে উঠল এবং হঠাৎ রক্ত-শীতল-করা আর্তনাদ করে পরীগুলি পাখা ঝাপটে আকাশের ওড়ার চেষ্টা করতে লাগল। মেয়েলি গলায় কাতর শব্দ করে যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে পরীগুলি মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। পিয়াল চিৎকার করে বলল, "কী করলে মামা! কী করলে তুমি!"

মামা তোতলাতে তোতলাতে বললেন, "গে-গে গেছে সবগুলি?"

"কী ভয় পেয়েছে তুমি শোন নি? কেন লাইট জ্বালালে?"

"সর্বনাশ!" মামা কাঁপা গলায় দরুদশরিফ পড়ে নিজের বুকে ফুঁ দিয়ে বললেন, "আরেকটু হলে গিয়েছিলাম আর কি!"

www.MurchOna.com

পিয়ালের ইচ্ছে হল মামাকে মেঝেতে চেপে ধরে ছয়-ব্যাটারির টর্চলাইট দিয়ে মাথার মাঝে একটা ঘা বসিয়ে দেয়, কিন্তু সেটা তো আর সত্যিই করতে পারে না, তাই চালাঘর থেকে বের হয়ে দিঘির দিকে হাঁটতে লাগল। মামা পিছন থেকে ভাঙা গলায় বললেন, "পিয়াল! আমাকে একা ফেলে কোথায় যাচ্ছিস?"

"কোথাও না। দিঘির ঘাট থেকে হেঁটে আসছি।"

"যাসনে একা একা—কিছু-একটা হয়ে যাবে পরে।"

পিয়াল মামার কথায় কোনো পাত্তা না দিয়ে দিঘির ঘাটের কাছে এসে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠল, কী-একটা সিঁড়িতে পড়ে আছে। পিয়াল দৌড়ে গেল কাছে, জোছনার আলোতে অবাক হয়ে দেখল একটা পরী সিঁড়িতে পড়ে আছে। পিয়াল ছুটে গেল কাছে, জোছনার নরম আলোতে পরীটিকে আবছা দেখা যাচ্ছে, হাত দুটি ছড়িয়ে আছে পাশে, একটা পাখা খোলা, অন্যটি আধখোলা, শরীরে হালকা অর্ধস্বচ্ছ একধরনের কাপড়।

মামা চালাঘর থেকে কাঁদোকাঁদো গলায় বললেন, "কী হল পিয়াল?"

পিয়াল মামার কথার উত্তর না দিয়ে পরীটার কাছে ঝুঁকে এল, মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে এল সাথে সাথে। সাবধানে সে পরীটিকে স্পর্শ করে, মনে হয় এক্ষুনি বুঝি সেটি অদৃশ্য হয়ে যাবে, কিন্তু পরীটি অদৃশ্য হয়ে গেল না। পিয়াল পরীটির হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "এই যে, এই যে পরী—ওঠো।"

পরীটি উঠল না, নিথর হয়ে পড়ে রইল। মামা চালাঘর থেকে আবার ভাঙা গলায় ডাকলেন, "কী হল পিয়াল?"

পিয়াল উঠে দাঁড়িয়ে বল, "পরী।"

"পরী?"

"হ্যাঁ।"

শওকত মামা প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন, "তা হলে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? পালিয়ে আয়।"

পিয়াল সাবধানে পরীটাকে তোলার চেষ্টা করে অবাক হয়ে দেখল সেটি একেবারে পেঁজা তুলোর মতো হালকা। পিয়াল দুই হাতে জড়িয়ে ধরে পরীটাকে তুলে নেয়, মামা দূর থেকে চিৎকার করে বললেন, "কী করছিস? কী করছিস তুই!"

পিয়াল কোনো কথা না বলে পরীটাকে তুলে নিয়ে চালাঘরের দিকে হাঁটতে থাকে, মনে হতে থাকে হালকা পরীটি তার হাতের চাপে বুঝি গুঁড়িয়ে যাবে। সাবধানে বুকের সাথে চেপে ধরে নিয়ে এসে পিয়াল পরীটাকে চালাঘরের মেঝেতে শুইয়ে দিল। মামা একবার টর্চলাইট জ্বালাতে চেষ্টা

www.MurchOna.com

করেছিলেন, পিয়াল চিৎকার করে বলল, "আলো জ্বালিয়ো না মামা, দেখছ না কী হয় আলো জ্বালালে!"

পিয়াল পরীটার বুকের কাছে কান লাগিয়ে শুনতে পেল বুকের মাঝে ধুকপুক শব্দ হচ্ছে। নিশ্বাস ফেলে বলল, "এখনও বেঁচে আছে মামা। একজন ডাক্তার ডাকতে হবে।"

"ডাক্তার?" মামা ঢোক গিলে বললেন, "ডাক্তার কী করবে?"

"চিকিৎসা করবে।"

"পরীর চিকিৎসা?" মামা আস্তে আস্তে তার সাহস ফিরে পাচ্ছেন, একটু এগিয়ে এসে বললেন, "তার চাইতে দড়ি দিয়ে হাত-পা বেঁধে ফ্যাল।"

"হা পা বেঁধে ফেলব?"

"হ্যাঁ, তারপর ধরে নিয়ে যাই ঢাকা। চিন্তা করতে পারিস কী অবস্থা হবে জ্যান্ত একটা পরী ধরে নিয়ে গেলে? চিড়িয়াখানায় বিক্রি করে দেব। তার চাইতে ভালো বি.বি.সি. নাহয় সি.এন. এন.—"

শওকত মামা উৎসাহ নিয়ে এবারে এগিয়ে এসে সত্যি সত্যি জুতোর ফিতা খুলে সেটা দিয়েই পরীর হাত-পা বাঁধতে শুরু করলেন। পিয়াল বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতেই মামা একটা ধমক দিয়ে বললেন, "হঠাৎ জ্ঞান ফিরে যদি উড়ে যায়?"

পরীকে বাঁধতে বাঁধতে মামা তাকে পরীক্ষা করতে লাগলেন, বললেন, "পাখাটা দেখেছিস কীরকম?"

"কীরকম?"

"আমি ভেবেছিলাম বাদুড়ের মতো হবে, চামড়ার। আসলে এটা পালকের। এই দ্যাখ পিঠের হাড় থেকে বের হয়ে এসেছে। কী হালকা পালক দেখেছিস?"

পিয়াল এগিয়ে এসে বলল, "মামা, প্লীজ বেঁধো না, ব্যথা পাবে।"

"চুপ কর তুই গাধা কোথাকার! একটা পরী নিয়ে যদি সেটা নিয়ে গবেষণা করা যায় পৃথিবীতে কীরকম হৈচৈ পড়ে যাবে টের পাচ্ছিস?"

পিয়াল ব্যাপারটা টের পাচ্ছিল এবং সেজন্যেই তার মন-খারাপ হয়ে গেল। মামা চকচকে চোখে বললেন, "শরীরটা একেবারে হালকা, এইজন্যে উড়তে পারে। হাড়গুলি নিশ্চয়ই ফাঁপা। মাসলগুলি দেখেছিস কীরকম?"

ফুটফুটে অচেতন পরীটার দিকে তাকিয়ে পিয়ালের একেবারে বুকটা ভেঙে যাচ্ছিল, সে কিছুই বলল না। মামা বাঁধা শেষ করে বললেন, "এখন আর পালাতে পারবে না।"

মামা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "এখন দরকার একটা বাক্স।"

"বাক্স?"

"হ্যাঁ। বাক্সে ভরে ঢাকা নিতে হবে, কেউ দেখে ফেললে বিপদ হয়ে যাবে।"

www.MurchOna.com

উত্তেজনায় মামার নিশ্বাস পড়ে না, পিয়ালের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "আর কোনো চিন্তা নাইরে পিয়াল, এক ধাক্কায় বড়লোক হয়ে যাব। আর চাকরিও খুঁজতে হবে না। লোকজন এখন আমার কাছে আসবে চাকরি খুঁজতে। পরীটাকে নিয়ে একটা আমেরিকা ট্রিপ দিতে পারলে ফাটাফাটি হয়ে যাবে।"

মামা চালাঘরে পায়চারি করতে করতে বললেন, "জিনেটিক ইঞ্জিনিয়ারদের আর মাইক্রোবায়োলজিস্টদের মাথা-খারাপ হয়ে যাবে। ডি. এন. এ. স্ট্রাকচার কীরকম কে জানে?"

পিয়াল বলল, "মামা, যদি আর জ্ঞান ফিরে না আসে?"

"আসবে না কেন? আমরা তো আর গুলি করি নাই, শুধু লাইট ফেলেছি।"

"কে বলতে পারে, ওদের কাছে লাইটটই হয়তো গুলির মতো।"

"তা হলে আর কী করা!" মামা হাত নেড়ে বললেন, "মরে গেলে মরে যাবে আর কি! শুনিস নি কথায় বলে মরা হাতির দাম লাখ টাকা! সেরকম মরা পরীর দাম হচ্ছে কোটি টাকা!"

পিয়াল কিছু বলল না। মামা হাতে কিল দিয়ে বললেন, কেটেকুটে ভিতরে কী আছে দেখা যাবে তখন। হার্টের ফাংশন কীরকম, লাংস কত বড়, কিডনি কয়টা, লিভারের সাইজ কী! চিন্তা করতে পারিস তুই? সবকিছু দেখা শেষ হলে ফর্মালিনে ডুবিয়ে বড় কাচের অ্যাকুয়ারিয়ামে ডুবিয়ে রাখব।"

পরীটাকে নিয়ে কী করা যায় সেটা নিয়ে মামা খানিকক্ষণ চিন্তা করে আর দেরি করতে চাইলেন না। ঠিক করলেন তখন-তখনি লোকালয়ে গিয়ে একটা বাক্স তৈরি করে নিয়ে আসবেন, ভোর হওয়ার আগেই সেই বাক্স নিয়ে ঢাকা রওনা দিয়ে দেবেন। বাক্স আনতে যাবার সময় পিয়াল একা একা এই পরীকে পাহারা দিতে ভয় পাবে কি না জানতে চাইলেন, পিয়াল জানাল সে ভয় পাবে না। শওকত মামা বললেন, তিনি শুধু যাবেন আর আসবেন—ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই। মামা তাঁর ছয়-ব্যাটারির টর্চলাইট জ্বালিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে যাবার সাথে সাথে পিয়াল পরীটার গালে হাত দিয়ে অল্প অল্প নেড়ে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। মানুষের মুখে পানির ঝাপটা দিলে জ্ঞান ফিরে আসে, পরীদেরও সেটা হবে কি না কে জানে! সাত-পাঁচ ভেবে দিঘি থেকে এক আঁজলা পানি এনে সে পরীটার মুখে ঝাপটা দিল, সাথে সাথেই পরীটা নড়ে উঠে একটা কাতর শব্দ করল।

পিয়াল বলল, "এই যে, এই যে পরী, জেগে ওঠো।"

সত্যি সত্যি পরীটা জেগে উঠল, ধড়মড় করে উঠে বসার চেষ্টা করতে করতে দুই হাত-পা নিজের কাছে টেনে এনে ভয় পেয়ে ঘরের এক কোনার

দিকে যেতে চেষ্টা করতে থাকে। পিয়াল উঠে দাঁড়িয়ে দুই হাত নেড়ে বলল, "তোমার কোনো ভয় নেই। আমি কিছু করব না—কিছু করব না।"

পরীটা পিয়ালের কথা বুঝতে পারল কি না বোঝা গেল না, কিন্তু ছটফট করাটা থামিয়ে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইল। পিয়াল বলল, "আমার নাম পিয়াল। তোমার নাম কী?"

পরীটা কোনো কথা বলল না। পিয়াল বলল, "তোমরা কোথায় থাক, তোমার দেশ কোথায়?"

পরীটা একটা নিশ্বাস ফেলে হঠাৎ রিনরিনে মিষ্টি গলায় বলল, "ব্যথা কেন দিলে আলো জ্বেলে জ্বেলে?"

পিয়াল বলল, "আমি দিইনি। আমার মামা—এম. এস-সি. পাশ করে বেকার বসে আছেন—সেই মামা দিয়েছেন। তোমার কি বেশি ব্যথা লেগেছে?"

পরীটা মাথা নাড়ল। পিয়াল বলল, "আমি খুব দুঃখিত। ভেরি ভেরি সরি। আমার কাছে প্যারাসিটামল আছে, দুটো খেলে ব্যথা কমে যাবে। দেব?"

পরীটা কোনো কথা বলল না, বড় বড় চোখে পিয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। পিয়াল একটু এগিয়ে এসে বলল, "তুমি কি উড়তে পারবে?"

পরীটা পাখা নেড়ে বলল, "জোছনা আলো পেলে যাব উড়ে উড়ে যাব।"

পরীটা কবিতার মতো সুর করে কথা বলে, আর গলার স্বর কী মিষ্টি, শুধু শুনতেই ইচ্ছে করে! পিয়াল বলল, "তা হলে তুমি উড়ে যাও। আমার মামা গেছেন একটা বাক্স আনতে। যদি নিয়ে আসেন তা হলে বাক্সে ভরে নিয়ে যাবেন ঢাকা।"

পরীটা আবার সুর করে বলল, "নিবে নিবে ঢাকা নিবে—ঢাকা দিবে কেন?"

"ঢাকা দেবে না, ঢাকা নেবে। ঢাকা হচ্ছে একটা বড় শহর। সেখানে অনেক টেম্পো আর স্কুটার আর কালো ধোঁয়া। বাইরে বের হলেই চোখ জ্বলতে থাকে।"

পরীটা পিয়ালের কথা বুঝতে পারল বলে মনে হল না, কেমন যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। পিয়াল আবার বলল, "তুমি তাড়াতাড়ি উড়ে চলে যাও। আমার মামা বাক্স নিয়ে এলে বড় বিপদ হয়ে যাবে।"

"কী হবে বিপদ?"

"তোমাকে বাক্সে ভরে নিয়ে যাবে।"

"নিবে নিবে কোথা নিবে? কেন নিবে মোরে?"

পিয়াল হাত নেড়ে বলল, "সেটা তুমি বুঝবে না। মানুষ কখনো পরী দেখে নাই, তাই পরী দেখিয়ে আমার মামা অনেক টাকা রোজগার করতে

www.MurchOna.com

চাইছে। চাকরিবাকরি নাই তো তাই মাথার মাঝে শুধু টাকা রোজগারের ধান্ধা।"

"টাকা? টাকা কিসে টাকা? টাকাতে কী হয়?"

"সেটা অনেক জটিল প্রশ্ন। টাকা দিয়ে কী হয় যদি না জান তা হলে তোমাকে বোঝানো খুব মুশকিল। তোমাকে এখন বোঝাতে পারব না। তুমি বরং ওঠো।"

পরী তার পাখা নেড়ে উঠে দাঁড়াল, ভেসে ভেসে চালাঘর থেকে বাইরে দাঁড়াল। জোছনার নরম আলোতে কী চমৎকার লাগছে পরীটাকে। পিয়াল জিজ্ঞেস করল, "তোমার নাম কী পরী?"

"মোর নাম ফুলবতী।"

"বাহ্! কী সুন্দর নাম! তুমি কোথায় থাক ফুলবতী?"

"মোরা থাকি ফুলবনে।"

"ইশ! কী মজা!" পিয়াল জিব দিয়ে শব্দ করে বলল, "তোমাদের স্কুলে যেতে হয়?"

"স্কুল কী তা চিনি না গো বলো বুঝিয়ে।"

"না চিনলে তোমাকে বুঝিয়ে মন-খারাপ করব না, খুব কঠিন জায়গা স্কুল। সব রাগী রাগী স্যারেরা আর আপারা থাকে—সাথে এই বড় বড় হোমওয়ার্ক!"

পরী ফুলবতী পাখা নেড়ে নেড়ে একটু উপরে উঠে এল। পিয়াল বলল, "ফুলবতী—তোমাদের শুধু মেয়ে-পরী কেন? ছেলে-পরী নাই?"

ফুলবতী খিলখিল করে হেসে বলল, "চাঁদ কেন দুটি নেই কে দেবে জবাব?"

"তোমরা কী খাও ফুলবতী?"

"জোছনার আলো খাই—ফুলের সুবাস খাই, খাই কুয়াশা।"

"ইশ কী মজা! কপকপ করে এখন তুমি জোছনা খাবে? জোছনা খেতে কেমন লাগে?"

"মিষ্টি মিষ্টি টক টক, খাও-না তুমি!"

"আমরা জোছনা খেতে পারি না। আমাদের ডাল দিয়ে মেখে ভাত খেতে হয়। সবজি বলে একটা জিনিস আছে সেটাও খেতে হয়। সবেচেয় ভয়ংকর সবজির নাম করলা, তেতো খেতে।"

ফুলবতী পাখা নেড়ে খানিকটা উপরে উঠে আবার নিচে নেমে এসে বলল, "ঐ দূরে লোক দেখি আলো হাতে আসে।"

"মামা—আমার মামা। পালাও তুমি।"

"যাই তবে পিলাই।"

"পিলাই না, আমার নাম হচ্ছে পিয়াল।"

"পিয়াল পিয়াল তবে যাই উড়ে উড়ে।"

www.MurchOna.com

"যাও—আর ইয়ে মানে তোমাদের কোনো টেলিফোন আছে যেখানে মনে করো তোমাকে ডাকা যাবে?"

"টেলিফোন? সে আবার যন্ত্রণা কোন?"

"তা ঠিকই বলেছ, একটু যন্ত্রণাই বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে খুব কাজে লাগে। যেমন মনে করো আমার যদি তোমার সাথে কথা বলার ইচ্ছা করত ফোনে ডায়াল করে বলতাম, হ্যালো, ফুলবতী, কী চমৎকার জোছনা! খাবে নাকি একটু—তুমি শাঁইশাঁই করে উড়ে চলে আসতে—"

"এ আর সমস্যা কী, সমাধান সহজ!"

ফুলবতী আকাশে একপাক ঘুরে তার পায়ে বাঁধা নূপুর খুলে পিয়ালের হাতে দিয়ে বলল, "পূর্ণিমার রাতে তুমি বাজিও নূপুর, যেথা থাকি খোঁজ পেয়ে চলে আসিব।"

"আসবে? সত্যি আসবে? খোদার কসম?"

"তুমি এত ভালো ছেলে আসিব না কেন? যতবার চাও তুমি দেখা দিয়ে যাব!"

ঠিক তখন খুব কাছেই শওকত মামার গলার আওয়াজ শোনা গেল, উত্তেজিতভাবে কার সাথে জানি কথা বলতে বলতে আসছেন। ফুলবতী তখন আকাশ থেকে উড়ে নিচে নেমে এসে পিয়ালের গালে আলতোভাবে নিজের গাল স্পর্শ করে আকাশে উড়ে গেল—যতক্ষণ দেখা গেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিয়াল তাকিয়ে রইল।

শওকত মামা এসে পিয়ালকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু অবাক হয়ে গেলেন, বললেন, "কী হল? তুই বাইরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?"

"কেন? কী হয়েছে?"

"বললাম না একটু চোখে-চোখে রাখতে? যদি পালিয়ে যায়?"

"কী পালিয়ে যায়?"

"পরী।"

"পরী! কী বলছ? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, উঠে দেখি তুমি নাই!"

মামা কেমন জানি রেগে উঠে চালাঘরে ঢুকে আবার বের হয়ে এলেন, "কোথায় গেল? কোথায় গেল পরী?"

"মামা, তুমি কী না কী স্বপ্ন দেখেছ! পরী কোথা থেকে আসবে?"

"কী বলছিস তুই? তুই নিজে কোলে করে পরীটাকে আনলি—মনে নাই জুতোর ফিতে দিয়ে বাঁধলাম?"

"আমি জানি না মামা। আমি ঘুমাচ্ছিলাম, ঘুম থেকে উঠে দেখি কেউ নাই। বাইরে এসে একটু জোছনা খাচ্ছিলাম—মানে দেখছিলাম—"

মামার সাথে আরও দুইজন মানুষ এসেছে, একজনের মাথায় একটা বড় বাক্স। সে বাক্সটা নিচে রেখে বলল, "তখনই বলেছিলাম পাগল-মানুষের কথা শুনে কাজ নেই—"

www.MurchOna.com

শওকত মামা একটু রেগে বললেন, "আমি পাগল?"

দ্বিতীয় মানুষটা কানে গুঁজে রাখা একটা বিড়ি বের করে ম্যাচ দিয়ে ধরাতে ধরাতে বলল, "আপনি পাগল না ছাগল সেই তর্কে গিয়ে কাজ নাই। দুই হাজার টাকার কন্ট্রাক্ট করেছেন, টাকা দেন চলে যাই।"

মামা চিৎকার করে বললেন, "পরী থাকলে দিতাম। পরী নেই খামাখা টাকা দেব কেন? আমাকে কি বেকুব পেয়েছ?"

ভোররাতে দিঘির পাশে খানিকক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি হল, শেষ পর্যন্ত কিছু টাকা দিয়ে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করা হল।

বাসে করে শওকত মামা আর পিয়াল ফিরে আসছিল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মামা বললেন, "বুঝলি পিয়াল? পরীর স্বপ্নটা যে দেখেছিলাম সেটা এত বাস্তব স্বপ্ন যে তুই চিন্তাও করতে পারবি না।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। দেখলাম তুই কোলে করে আনলি—হালকা তুলোর মতো পরী। একেবারে অতি বাস্তব।"

"কোনটা বাস্তব কোনটা স্বপ্ন সেটা বোঝা খুব মুশকিল মামা। খুব মুশকিল। মাঝে মাঝে যখন জোছনা দেখি তখন মনে হয় কপকপ করে খেয়ে ফেলি। কিন্তু বাস্তবে জোছনা কি খাওয়া যায়?"

"কী বললি?"

"নাহ্। কিছু না।" পিয়াল হঠাৎ সুর করে বলল, "কিছু নাহি বলিলাম বলিলাম আমি।"

শওকত মামা অবাক হয়ে পিয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পিয়াল খুব সাবধানে তার পকেটে-রাখা নূপুরটা স্পর্শ করে দেখল—হারিয়ে না যায় আবার!

www.MurchOna.com

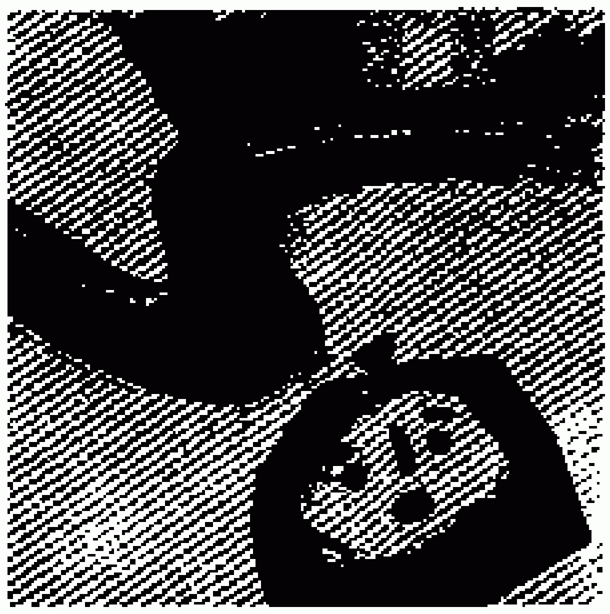

তিন্নি ও বন্যা

রুনু আপা ক্লাসে কবিতা পড়াতে পড়াতে হঠাৎ করে থেমে গিয়ে বললেন, "আমার মনটা ভালো নাই রে।"

রুনু আপা স্কুলের সবচেয়ে প্রিয় আপা—তাঁর মন ভালো নেই শুনে সারা ক্লাসের সবার মন-খারাপ হয়ে গেল। তিন্নি ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, "কেন আপা? আপনার মন ভালো নেই কেন?"

রুনু আপা একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "দেখছিস না, কী বন্যা হচ্ছে দেশে!"

"ও।" তিন্নি মুখে একটা দুশ্চিন্তার ভাব ফুটিয়ে রাখলেও মনেমনে নিশ্চিন্ত হল। যদি এরকম হত যে রুনু আপাকে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে তা হলে সেটা হবে সত্যিকারের মন-খারাপের কথা।

রুনু আপা বাংলা বইটা টেবিলের উপরে রেখে একটু এগিয়ে এসে বললেন, "তোরা খবরের কাগজে টেলিভিশনে দেখছিস না দেশে কী ভয়ানক বন্যা শুরু হয়েছে?"

ক্লাসের ছেলেমেয়েরা একটু নড়েচড়ে বসল। তারা মাত্র ক্লাস থ্রীতে পড়ে, খবরের কাগজ পড়তে তাদের একটুও ভালো লাগে না। সত্যি কথা বলতে কী, এই ছোট ছোট করে লেখাগুলি পড়ে বড়রা কী মজা পায় কে জানে! টেলিভিশনে তারা শুধু কার্টুন দেখে। খবরের সময় যখন মন্ত্রীদের দেখানো শুরু হয় তখন তারা সব সময় টেলিভিশন বন্ধ করে দেয়। এই কথাগুলি অবিশ্যি রুনু আপাকে বলা যাবে না, তাই তারা চুপ করে রইল। খবরের কাগজ আর টেলিভিশনে না দেখলেও তারা অবিশ্যি টের পাচ্ছে যে দেশে বন্যা হচ্ছে, বড়রা কথা বললেই আজকাল শুধু বন্যার কথা বলে।

www.MurchOna.com

স্বপন হাত তুলে বলল, "আপা!"

"কী হল স্বপন?"

"আমাদের এখানে কি বন্যা হবে?"

আপা মাথা নাড়লেন, "না। আমাদের এই এলাকা তো অনেক উঁচু তাই এখানে কখনো বন্যা হয় না।"

স্বপনের মুখে হাসি ফুটে উঠল, বলল, "যাক বাবা! বেঁচে গেলাম আমরা।"

রুনু আপা স্বপনের দিকে তাকিয়ে একটা নিশ্বাস ফেললেন, কোনো কথা বললেন না। তিন্নি চোখের কোনা দিয়ে একবার স্বপনকে আরেকবার রুনু আপাকে দেখল। স্বপনটা হচ্ছে এক নম্বরের গাধা, না হলে কেউ এরকম স্বার্থপরের মতো কথা বলে? এখানে বন্যা হচ্ছে না বলে যদি খুশি হতে হয় সেটা হতে হবে মনেমনে, জোরে জোরে সেটা কি বলা উচিত? স্বপনের কথা শুনে রুনু আপার নিশ্চয়ই মন-খারাপ হয়েছে, কিন্তু আপার মুখ দেখে সেটা বোঝা গেল না।

স্বাতি হচ্ছে ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল—তাই সে ফার্স্ট গার্লের মতো প্রশ্ন করার জন্যে হাত তুলল। "আপা!"

"কী?"

"বন্যা কেন হয় আপা?"

"আমাদের দেশটাই আসলে বন্যা দিয়ে তৈরি। এই দেশের উপর দিয়ে শত শত নদী গিয়েছে। যখন বৃষ্টি হয় তখন বৃষ্টির পানি এই নদী দিয়ে সমুদ্রে যায়। যদি কখনো খুব বেশি বৃষ্টি হয় তা হলে নদী দিয়ে সব পানি যেতে পারে না—তখনই বন্যা হয়।"

"ও।" স্বাতি খুব গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল, যেন সবকিছু সে বুঝে ফেলেছে।

ইমরান হচ্ছে ক্লাসের সবচেয়ে ফাজিল, সে দাঁত বের করে হেসে বলল, "আপা, একটা খুব বড় ছাতা তৈরি করে বাংলাদেশের ওপর ধরে রাখলে কেমন হয়? তা হলে আর বৃষ্টি হবে না।"

ইমরানের কথা শুনে রুনু আপা ফিক করে হেসে ফেললেন আর তাঁকে হাসতে দেখে ক্লাসের আরও অনেকে হেসে ফেলল। বন্যায় এত মানুষ কষ্ট পাচ্ছে, তার মাঝে হাসাহাসি করা ঠিক হবে কি না ঠিক বুঝতে পারছিল না। রুনু আপা বললেন, "বাংলাদেশে বৃষ্টি না হলেও তো বন্যা হতে পারে। নদীগুলি কি শুধু বাংলাদেশের বৃষ্টির পানি আনছে? ইন্ডিয়ার পানি আনছে, নেপালের পানি আনছে—তাই তোর ছাতাটা হতে হবে বিশাল! বাংলাদেশ,

www.MurchOna.com

ইন্ডিয়া, নেপাল, ভুটান, হিমালয় পর্যন্ত ঢেকে ফেলতে হবে। এত বড় ছাতা নিয়ে তুই দাঁড়িয়ে থাকতে পারবি তো?"

সাগর বলল, "পারবে না আপা! পারবে না!"

রুনু আপা মাথা নেড়ে বললেন, "পারবি না! আর আসলে বৃষ্টি আটকে ফেলাও তো ঠিক হবে না। বৃষ্টি ছাড়া পৃথিবী কি বেঁচে থাকতে পারে? সারা পৃথিবী শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে যাবে। জীবন মানেই হচ্ছে পানি আর পানি হচ্ছে জীবন। যেখানে পানি নেই সেখানে জীবন নেই।"

স্বাতি ফার্স্ট গার্ল তাই বড় বড় জ্ঞানের জিনিস নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসে, সে বলল, "মঙ্গলগ্রহে সেইজন্যে কোনো জীবন নেই—তা-ই না আপা?"

"হ্যাঁ তা-ই।"

ইমরান হাততালি দিয়ে বলল, "তার মানে বন্যাও নাই।"

"জীবন না থাকলে বন্যা হলেই কী আর না হলেই কী? আর তা ছাড়া বন্যা না হওয়াই যে ঠিক সেটাই কে বলতে পারে? আমাদের দেশে প্রতি বছরই তো বন্যা হয়। একটুআধটু বন্যা হলে কেউ কিছু মনে করে না, মাঠ-ঘাট তলিয়ে যায় কয়দিনের জন্যে, পানি সরে গেলে জমিতে পলি পড়ে—সবাই এসব মেনে নিয়েছে। আমার কী মনে হয় জানিস?"

"কী আপা?"

"বাংলাদেশের মানুষ মনে হয় বন্যাকে একটু পছন্দই করে। সেটা কেমন করে বোঝা যায় বল দেখি?"

স্বপন বলল, "পানিতে ডুবে গেলে নৌকা করে যাওয়া যায়।"

"উঁহুঁ, হল না।"

ইমরান বলল, "স্কুল বন্ধ হয়ে যায়—স্কুলে যেতে হয় না।"

রুনু আপা হেসে বললেন, "সেটা তোর জন্যে ভালো খবর হতে পারে, কিন্তু সবার জন্যে তো ভালো না।"

"ঘরে বসে মাছ ধরা যায়?"

"উঁহুঁ।"

"টেলিভিশনে ছবি দেখা যায়?"

"উঁহুঁ হল না।"

"পারব না আপা। আপনি বলেন।"

"পারলি না? আচ্ছা ঠিক আছে আমি বলি। মানুষ যে যে জিনিস পছন্দ করে সেই সেই জিনিসের নাম রাখে। যেমন মনে কর ফুল—মানুষ ফুলের নামে ছেলেমেয়ের নাম রাখে—যেমন ধর শিউলি, বকুল, জুঁই। মানুষ পাখির

www.MurchOna.com

www.MurchOna.com

নামেও নাম রাখে—যেমন ময়না। মানুষ সুন্দর রঙের নামে নাম রাখে, সবুজ, নীলা আসমানি। চাঁদ-সুরুযের নামেও নাম রাখে। সোনা মানিকও নাম রাখে। সেরকম মানুষ বন্যাও নাম রাখে। বন্যাকে ভালো না বাসলে বন্যা নাম রাখত? কখনো রাখত না। কখনো শুনেছিস কারও নাম রেখেছে ভূমিকম্প কিংবা ঝড় কিংবা ডায়ারিয়া?

তিন্নি হাত তুলে চিৎকার করে বলল, "আমার ছোট খালার নাম বন্যা খালা! বন্যা খালা!"

রুনু আপা হেসে বললেন, "হ্যাঁ, ঐ যে খুব সুন্দর রবীন্দ্র সঙ্গীত গায়িকা রিজওয়ানা চৌধুরী বন্যা—"

স্বপন এবং সাগরও হাত তুলে চিৎকার করতে লাগল, দেখা গেল তাদেরও পরিচিত মানুষ রয়েছে যাদের নাম বন্যা।

রুনু আপা একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, "কাউকে যদি কেউ পছন্দ করে তখন যদি সে কষ্ট দেয় তা হলে মানুষ সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়। বন্যার বেলাতেও তা-ই, মানুষ আদর করে বন্যা নাম পর্যন্ত রাখে, তার পরে যখন সেই বন্যায় মানুষ কষ্ট পায় সেই কষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি।"

রুনু আপা কেমন যেন মন-খারাপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন আর তাঁকে দেখে ক্লাসের সবাই মন-খারাপ করে বসে রইল। আপা বললেন, "মানুষের কষ্ট হলে কী করতে হয় বল দেখি?"

তিন্নি হাত তুলে বলল, "সাহায্য করতে হয়।"

"ঠিক বলেছিস। সাহায্য করতে হয়। সাহায্য করলে কষ্ট কমে যায়। আনন্দ আর কষ্টের মাঝে একটা পার্থক্য আছে। আনন্দ ভাগাভাগি করলে কখনো কমে যায় না, যত বেশি মানুষের সাথে আনন্দ ভাগাভাগি করা যায় আনন্দ তত বেড়ে যায়। কষ্টের বেলায় তার উলটো, মানুষের সাথে কষ্ট ভাগাভাগি করলে সেটা কমে যায়, তাই যখন মানুষের কষ্ট হয় তখন সেটা সবাই মিলে ভাগাভাগি করে নিতে হয়।"

রুনু আপা এত সুন্দর করে কথা বলেন যে শুনে তিন্নির চোখে প্রায় পানি এসে যাচ্ছিল। সে সাবধানে চোখের পানি আটকে রেখে মাথা নাড়ল। তিন্নি কষ্ট ভাগাভাগি করে নেবে, কষ্ট ভাগাভাগি করে সে কমিয়ে দেবে। কেমন করে সেটা কাজ করে সেটা অবিশ্যি সে বুঝতে পারছিল না, তাই আবার হাত তুলল, বলল, "আপা!"

"কী হল তিন্নি?"

"কষ্ট কেমন করে ভাগাভাগি করতে হয়?"

www.MurchOna.com

"যেমন মনে কর তোর জন্মদিন আসছে, তখন তোর আব্বু তোকে জিজ্ঞেস করল, 'তিন্নি তুই কী উপহার নিবি?' তুই বললি 'না আব্বু, এই বছর আমার কোনো উপহার লাগবে না, আমার উপহারের টাকাটা বন্যা ত্রাণ তহবিলে দিয়ে দাও।' তখন কী হবে জানিস? জন্মদিনে তোর কোনো উপহার নেই বলে তোর মনে একটু কষ্ট হবে, সেই কষ্টটা আসলে অন্য একজনের কষ্ট। কষ্টটা তোর কাছে চলে এসেছে বলে তার আর কষ্ট হচ্ছে না। বুঝেছিস?"

তিন্নি মাথা নাড়ল, "বুঝেছি আপা।"

পরের কয়েকদিনে বন্যার অবস্থা ভালো না হয়ে আরও খারাপ হল। একদিন তিন্নিদের বাসায় মেহমান এসেছে, আম্মা তখন একজনকে পাঠালেন আইসক্রীম কিনে আনতে। সে খালিহাতে ফিরে এসে বলল, বন্যার জন্যে রাস্তা ডুবে গেছে তাই আইসক্রীম আসতে পারছে না। বাজারে নাকি পেঁয়াজও নেই। কয়দিন পর চাল-ডালও থাকবে না। পেঁয়াজ না থাকলে অবিশ্যি তিন্নির কিছু আসে যায় না, সে পেঁয়াজ খায় না, কিন্তু চাল-ডাল না থাকলে তারা ভাত খাবে কেমন করে? প্রতিদিন খবরের কাগজে বন্যার ছবি বের হচ্ছে, মানুষেরা, ছোট বাচ্চারা বুকপানিতে ডুবে আছে, কী কষ্ট লাগে দেখলে!

একদিন তিন্নিদের স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা সব ক্লাসে ক্লাসে গেল বন্যার জন্যে সাহায্য তুলতে। যে যেভাবে পারে সেভাবে যেন সাহায্য করে, টাকা-পয়সা জামা-কাপড়, খাবারদাবার যা-কিছু ইচ্ছে তা-ই নিয়ে আসা যাবে।

বাসায় গিয়ে তিন্নি তার জমানো টাকা বের করল, তার পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে একটা চকলেটের খালি কৌটা থাকে, সেখানে সে অনেকদিন থেকে টাকা জমাচ্ছে। টাকা জমিয়ে সে কী করবে এখনও ঠিক করে নি, নিউমার্কেটে সে একটা পেন্সিল-বক্স দেখেছে—এত সুন্দর যে দেখলে মাথা ঘুরে যায়, সেটা কিনতে পারে। কিংবা বইমেলা থেকে কয়েকটা বই কিনতে পারে। সুন্দর কলম তার খুব ভালো লাগে, সেটাও কিনতে পারে। এখন অবিশ্যি ভিন্ন কথা—টাকাটা সে বন্যাত্রাণে দিয়ে দেবে। রুনু আপা যেভাবে বলেছেন। কষ্ট ভাগাভাগি করে নিতে হয়—কষ্ট ভাগাভাগি করলে সেটা কমে যায়।

www.MurchOna.com

পরদিন যখন উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা তাদের ক্লাসে এল, তিন্নি তার ব্যাগ থেকে কৌটাটা বের করে সব টাকা তাদের হাতে তুলে দিল। উঁচু ক্লাসের রায়হান ভাই অবাক হয়ে বলল, "সব টাকা দিয়ে দিচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"সব টাকা তোমার দিতে হবে না। তোমার যেটুকু ইচ্ছে সেটুকু দিলেই হবে।"

তিন্নি গম্ভীর মুখে বলল, "আমি সবটাই দিতে চাই।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ।"

রায়হান ভাই কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তিন্নির দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর টাকাগুলি গুনতে শুরু করল, তিন্নি অনেকদিন থেকে টাকা জমাচ্ছে, বেশির ভাগই খুচরা টাকা।

টিফিনের ছুটিতে সবাই ছোটাছুটি করে খেলে, আজ বৃষ্টি হচ্ছে বলে কেউ বাইরে যেতে পারছে না, বারান্দায় ক্লাসঘরে লুটোপুটি করছে। ছোট জায়গার মাঝেই তিন্নিরা কুমির কুমির খেলা শুরু করেছে তখন হঠাৎ সুমন এসে হাজির হল। সুমন তিন্নির বড় ভাই—তার থেকে চার বছরের বড়, কিন্তু সব সময় এমন ভান করে যেন সে এত বড় হয়ে গেছে যেন কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। তিন্নিকে ডেকে বলল, "তিন্নি, শোন।"

"কী ভাইয়া?"

"রায়হান ভাই বলেছে তুই নাকি সব টাকা বন্যার জন্যে দিয়ে দিয়েছিস?"

"হ্যাঁ।"

সুমন মুখ শক্ত করে বলল, "তুই একটা গাধা।"

তিন্নি মুখ কালো করে বলল, "কী? কী বললে?"

"আমি বলছি তুই একটা গাধা—এতগুলি টাকা নষ্ট করলি! আমাকে দিয়ে দিলি না কেন?"

"তোমাকে কেন দেব? তোমার কি বন্যাতে কোনো ক্ষতি হয়েছে?"

সুমন রাগ হয়ে বলল, "তুই কি ভাবছিস যে তুই মাদার তেরেসা হয়ে গেছিস?"

তিন্নির চোখে প্রায় পানি এসে যাচ্ছিল, অনেক কষ্ট করে সে পানি আটকে রাখল। সুমন মুখ বাঁকা করে হেসে বলল, "দেশে কত বড় বন্যা হয়েছে জানিস? তিন কোটি মানুষের ঘরবাড়ি ভেসে গেছে। এখন বিদেশ থেকে মিলিওন মিলিওন ডলার সাহায্য আসতে হবে! তুই ভাবছিস তোর দুইশো টাকা দিয়ে তিন কোটি মানুষ বেঁচে যাবে?"

www.MurchOna.com

"দুইশো না—দুইশো একত্রিশ টাকা।"

"ঐ হল—একই কথা। তিন কোটি মানুষের মাঝে দুইশো একত্রিশ টাকা ভাগ করে দিলে একজনের ভাগে কতটুকু পড়ে? গাধা কোথাকার! খামোকা টাকাটা নষ্ট করলি।"

সুমন চলে যাবার পর তিন্নির এত মন-খারাপ হল যে বলার মতো নয়। তার চোখে পানি এসে গেল আর সেটা যেন কেউ দেখতে না পারে সেজন্যে সে বারান্দার এক কোনায় দাঁড়িয়ে রইল। তার এত কষ্ট করে জমানো দুইশো একত্রিশ টাকা আসলেই কি নষ্ট হয়েছে? ভাইয়া তো ঠিকই বলেছে, যেখানে কোটি কোটি টাকা লাগবে সেখানে তার এই দুইশো একত্রিশ টাকা দিয়ে কী লাভ? বারান্দার কোনায় দাঁড়িয়ে থেকে যে বাতাসের সাথে সাথে বৃষ্টি এসে তাকে একটু একটু ভিজিয়ে দিচ্ছে সেটাও পর্যন্ত তার খেয়াল থাকল না। কতক্ষণ সে দাঁড়িয়ে থাকত কে জানে কিন্তু হঠাৎ সেখানে রুনু আপা এসে হাজির হলেন, গলা উঁচিয়ে বললেন, "তিন্নি, বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছিস কেন?"

তিন্নি কোনো কথা না বলে বৃষ্টির ছাট থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে একটু ভিতরে সরে এল। রুনু আপা তিন্নির মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ করে কিছু-একটা আন্দাজ করতে পেরে কাছে এগিয়ে এলেন। তিন্নির পিঠে হাত রেখে বললেন, "তিন্নি, কী হয়েছে?"

তিন্নি এবারে ভেউভেউ করে কেঁদে ফেলল। রুনু আপা মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "কী হয়েছে বল।"

"ভাইয়া বকেছে।"

"কেন বকেছে?"

"আমি নাকি টাকা নষ্ট করেছি।"

"টাকা নষ্ট করেছিস? কখন?"

"বন্যার জন্যে টাকা দিয়ে।"

রুনু আপা কিছু না বলে তিন্নির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিন্নি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, "এত বড় বন্যার জন্যে নাকি কোটি কোটি টাকা লাগবে। ভাইয়া বলেছে সেখানে আমার টাকাগুলি দিয়ে কিছুই হবে না। শুধুশুধু নষ্ট করেছি।

"তুই কত টাকা দিয়েছিস?"

"দুইশো একত্রিশ টাকা।"

রুনু আপা চোখ বড় বড় করে বললেন, "তোর নিজের টাকা?"

"হ্যাঁ। আমি জমিয়েছিলাম।"

www.MurchOna.com

"ভেরি গুড!" রুনু আপা খানিকক্ষণ নরম চোখে তিন্নির দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, "তিন্নি!"

"কী আপা?"

"চোখ বন্ধ কর।"

তিন্নি অবাক হয়ে বলল, "চোখ বন্ধ করব?"

"হ্যাঁ।"

"কেন আপা?"

"আগে বন্ধ কর, তারপর বলছি।"

তিন্নি চোখ বন্ধ করল। রুনু আপা বললেন, "কিছু দেখতে পাচ্ছিস?"

"না আপা।"

"ভালো করে দ্যাখ, খুব বন্যা হচ্ছে—পানিতে ভেসে যাচ্ছে—সেখানে বুকপানিতে একটা মা দাঁড়িয়ে আছে। একটা ছোট বাচ্চাকে বুকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। দেখতে পাচ্ছিস?"

তিন্নি চোখ বন্ধ করে কল্পনা করল বন্যায় সবকিছু ভেসে যাচ্ছে—সেখানে একটা মা ছোট একটা বাচ্চাকে বুকে চেপে দাঁড়িয়ে আছে। রুনু আপা বললেন, "বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে দ্যাখ, মুখটা কী শুকনো। কেন জানিস? বাচ্চাটার খুব অসুখ করেছে। স্যালাইন না দিলে বাচ্চাটা কিন্তু মারা যাবে।"

তিন্নি স্পষ্ট দেখতে পেল ছোট বাচ্চাটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। মুখ শুকনো, চোখের নিচে কালি। রুনু আপা আবার বললেন, "শব্দ শুনতে পাচ্ছিস তিন্নি?"

"কিসের শব্দ আপা?"

"ট্রলারের। ট্রলার করে ত্রাণ নিয়ে এসেছে। খাবার পানি এনেছে, ওষুধ এনেছে, স্যালাইন এনেছে। দেখতে পাচ্ছিস?"

তিন্নি স্পষ্ট দেখতে পেল ট্রলারে করে লোকজন ওষুধপত্র খাবার সাহায্য নিয়ে এসেছে।

"মায়ের কাছে ওষুধ আর স্যালাইন দিচ্ছে দেখতে পাচ্ছিস?"

তিন্নি মাথা নাড়ল।

"এই যে বাচ্চার কাছে ওষুধটা দিচ্ছে সেটা কোথা থেকে এসেছে জানিস?"

"কোথা থেকে?"

"তোর দুইশো একত্রিশ টাকা থেকে কেনা হয়েছে একশো টাকার ওষুধ। আর একশো ত্রিশ টাকার খাবার। ভালো করে দ্যাখ, ওষুধ আর স্যালাইন দিয়ে বাচ্চাটা ভালো হয়ে যাচ্ছে। দেখেছিস?"

www.MurchOna.com
suman_ahm@yahoo.com

www.MurchOna.com

তিন্নি সত্যি সত্যি দেখতে পেল ছোট রুগ্‌ণ বাচ্চাটা ভালো হয়ে উঠেছে, খিলখিল করে হাসছে তার মাকে ধরে। একটু আগে মায়ের মুখে কী দুশ্চিন্তা ছিল, এখন সেখানে কোনো দুশ্চিন্তা নেই—কী ভালো লাগছে দেখতে!

রুনু আপা তিন্নির কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, "বুঝলি তিন্নি—সত্যি সত্যি তোর টাকা দিয়ে একটা ছোট বাচ্চার জীবন বেঁচে যাবে। সেই বাচ্চাটা কে তুই হয়তো জানবি না, কিন্তু আছে একজন! বুঝলি?"

তিন্নি মাথা নাড়ল।

"এখনও মন-খারাপ আছে?"

তিন্নি মাথা নাড়ল, তার আর মন-খারাপ নেই। সে চোখ খুলে রুনু আপার দিকে তাকিয়ে লাজুক ভঙ্গিতে বলল, "আপা!"

"কী হল?"

"এই যে ছোট বাচ্চাটার অসুখ করেছিল সে আসলে একটা ছোট মেয়ে।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। আর—"

"আর কী?"

"মেয়েটা তো অনেক ছোট তাই তার জন্যে খাবার বেশি লাগে না। একশো ত্রিশ টাকা থেকে একশো টাকা বেঁচে গেছে। সেই টাকা দিয়ে লাল একটা ফ্রক কিনেছে।"

রুনু আপা গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লেন, "ঠিকই বলেছিস।"

"লাল ফ্রকটা পেয়ে খুব খুশি হয়েছে মেয়েটা।"

"কে না খুশি হবে এত সুন্দর ফ্রক পেলে!"

"আপা।" তিন্নি একটু ইতস্তত করে বলল, "আমি তো আসলে দুইশো একত্রিশ টাকা দিয়েছি—দুইশো ত্রিশ টাকা খরচ হয়েছে। এখনও এক টাকা রয়ে গেছে। মেয়েটাকে একটা লজেন্স কিনে দিই।"

"বেশি ছোট হলে কিন্তু খেতে পারবে না, গলায় আটকে যাবে। দেখিস।"

"না আপা, বেশি ছোট না। চুষে চুষে খেতে পারবে।"

"ঠিক আছে, তা হলে একটা লজেন্স কিনে দে।"

তিন্নি আবার চোখ বন্ধ করল, টুকটুকে লাল ফ্রক গায়ে দেওয়া ছোট মেয়েটিকে সে এখন একটি লজেন্স কিনে দেবে।

www.MurchOna.com
suman_ahmm@yahoo.com

Tinni O Bonya by Md. Jafar Iqbal

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
suman_ahm@yahoo.com